ইকবাল আলমগীর কবীর

মকবুলের ভুত

মকবুলের ভুত

ইকবাল আলমগীর কবীর

আমি ভুতে বিশ্বাস করি না তবে ভয় পাই। কথাটা আমার জন্য একেবারে একশভাগ মানানসই। আমি ভুত বিশ্বাস করি না কারন আমি জানি ভুত বলে কিছু নেই। কোনকালে ছিল না। যে যত বড়বড় কথাই বলুক না কেন আসলে কেউ কখনো ভুত দেখেনি। নিজেরা অকারনে ভয় পেয়েছে সেই ভয় অন্যদের দেখানোর জন্যই ভুতের গল্প করেছে। যে শুনেছে সে গল্প করেছে অন্যের কাছে। এখন সারা পৃথিবীর মানুষই শতশত ভুতের হাজার হাজার গল্প জানে।

তবে ভয় পাওয়ার বিষয়টা আলাদা। রাতের বেলা সবাই ঘুমিয়ে গেলে, চারিদিকে নিস-ব্ধ হয়ে গেলে জানালার বাইরে অন্ধকার আমগাছের দিকে তাকিয়ে মনে হয় ওখানে কিছু যেন রয়েছে। কিছু একটা গাছকে নাড়াচ্ছে। আমি জানি যে নাড়াচ্ছে সে বাতাস। বাতাসকে ভুত নামে ডাকার কোন কারন নেই। তাহলেও অন্যদিকে মুখ করে থাকতে চেষ্টা করি। সময়সময় জানালা বন্ধ করে দেই। মনে হয় অশরীরী কিছু জানালা দিয়ে ঢুকে পরতেও পারে। তার ওপর যখন কেউ রসিয়ে রসিয়ে নিজের দেখা ভুতের কিংবা জ্বীনের গল্প করে তখন কয়েকদিনের জন্য এই বিষয়টা আরো বেড়ে যায়।

যাক সেসব কথা। যা বলতে চাইছি তা হল এতকিছুর পরও একদিন ভুতের দেখা পেলাম। সত্যিকারের ভুত। আর তারচেয়ে মজার কথা, তাকে দেখে আমি মোটেও ভয় পেলাম না।

রাতের বেলা আধো ঘুমে আধো জাগরনে কার যেন অসি-ত্ব টের পেলাম ঘরের মধ্যে। খুটখাট শব্দ। একবার মনে হল ইদুর দৌড়ে বেড়াচ্ছে। তারপর মনে হল আরো বড় কিছু। রীতিমত মানুষের মত আকৃতি। বুঝতে পারছি তার অসি-ত্ব অথচ দেখতে পাচ্ছি না। ভয় পাচ্ছি নিজেই। সেটা কাটানোর জন্য তাকেই ভয় দেখাতে চেষ্টা করলাম। বললাম, 'কে রে বাবা চোর নাকি ? দামি জিনিষপত্র নেই, সময় থাকতে কেটে পর। নাকি ভুত ? নিজের পরিচয়টা দাও দেখি। নইলে দেব মাথায় বাড়ি।'

মনেমনে বললাম বাড়ি দেয়ার মত কোনকিছুই হাতের কাছে নেই। পুরো ঘর খুঁজলেও পাওয়া যাবে না। হাতের নাগালে বালিশ রয়েছে, বড়জোর সেটাই ছুড়ে মারা যেতে পারে।

শুধু কথাতেই কাজ বল। সে বলল, 'আমি মকবুলের ভুত।'

মকবুল নামে একজনকে আমি চিনতাম। আমার সাথে ছোটবেলায় স্কুলে পড়ত। এছাড়া অন্য কোন মকবুলকে আমি চিনি না। সেই মকবুল মারা আছে কিনা তাও জানি না। এর কথা সত্যি হলে সে মারা গেছে। মরে ভুত হয়েছে। তারপর এসেছে আমার কাছে। মকবুলের সাথে একসময় খুব ভাল বন্ধুত্ব ছিল আমার। হয়ত সেকথা ভেবেই।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'কি বললে ? তুমি মকবুলের ভুত ?'

সে বলল 'হ্যাঁ, আমি মকবুলের ভুত। আমাকে চিনতে পারছ না। এতবছর একসাথে পড়লাম, একসাথে থাকলাম। এতদিনের বন্ধুত্ব।'

আমার খটকা লাগল। নিশ্চয়ই কেউ ঠকবাজি করতে এসেছে। এসে এটাওটা বলে আমাকে ভোলানোর চেষ্টা করছে। আমি বললাম, 'তুমি বললেই আমি বিশ্বাস করব কেন ? তুমি যে ভুত তার প্রমান দাও।'

ভুত বলল, 'বেশ, কি প্রমান চাও ?'

আমি বললাম, 'তুমি মকবুলের ভুত তার প্রমান কি ?'

সাথেসাথে সে গড়গড় করে মকবুলের কথা বলতে শুরু করল। তার অনেকগুলো আমি জানি, অনেকগুলো জানি না, অনেকগুলো ভুলে গেছি, অনেকগুলি নতুন করে মনে পরল। তাকে জোর করে থামাতে হল।

'আচ্ছা, থামো-থামো। তোমাকে মকবুলের প্রমান দিতে হবে না। তুমি যে ভুত তার প্রমান আগে দাও।'

ভুত বলল, 'বেশ। কি প্রমান চাও ?'

আমি ভুতের জন্য কি পরীক্ষা নেয়া যায় তা ভাবতে শুরু করলাম। একটা মোক্ষম যুক্তি পেয়ে বললাম, 'আগে তোমার পা দেখি। ভুতের পা পিছন দিকে থাকে। সেজন্য ভুত সবসময় উল্টোদিকে যায়। দেখি তোমার পা কেমন ?'

ভুত বলল, 'আমার পা নেই। একসিডেন্টে আমার দুপা কাটা গেছে। আমি সেই চেহারা নিয়ে ভুত হয়েছি।'

আমি বিরক্ত হয়ে বললাম, 'তারমানে কারো যদি মাথা কাটা যায় তাহলে সে মাথাকাটা ভুত হবে ?'

ভুত বলল, 'সেটাই নিয়ম।'

আমি বললাম, 'নিয়ম না কচু। তোমার কাছে প্রমান নেই তাই মিথ্যে কথা সাজাচ্ছ।'

শুনে ভুত খুব মন খারাপ করল। মাথা নিচু করে এমন ভঙ্গি করল যেন কাঁদছে। দেখে আমারও খুব খারাপ লাগল। একেবারে যেন পুরনো দিনের সেই মকবুলের কথাই মনে হল। এবারে সহজভাবে বললাম, 'আচ্ছা, পায়ের কথা তাহলে যাক। তোমাকে কিছু একটা প্রমান দিতেই হবে। প্রমান ছাড়া আমি তোমাকে চিনব কেন ? প্রমান ছাড়া আমি ব্যাংকে গেলে কি টাকা দেবে ? নাকি ভোট দিতে দেবে ? ধরে সোজা থানায় নিয়ে যাবে। ভুতের দেশে থানা পুলিশ এসব নেই ?'

ভুত বলল, 'না নেই।'

আমি চমকে উঠলাম শুনে, 'নেই। তাহলে পুলিশ মরার পর কি হয় ? চোর মরার পর কি হয় ? দুজন পাল্টাপাল্টি করলেও চোর-পুলিশ দুইই থাকে।'

ভুত বলল, 'ভুতের দেশে চোর পুলিশের খেলা নেই। বড়লোক ছোটলোক নেই। নতুন নতুন যারা আসে তারা কিছুদিন এটা ওটা নিয়ে বড়াই করে, তারপরই ঠান্ডা হয়ে যায়। এখানে কার কি আছে তাতে কারো কিছু যায় আসে না। যে বড়াই করে তারদিকে কেউ ঘুরেও তাকায় না।'

আমি অবাক হলাম, 'তারমানে কেউ বড়াই করে না! কেউ তার বিষয়সম্পত্তি, টাকাপয়সা, স্বাস্থ্যচেহারা, বংশপরিচয়, শক্তি এসব নিয়ে বড়াই করে না!'

ভুত বলল, 'একবার একজন কোন বংশের কতবড় কেউকেটা ছিল তা নিয়ে বাহাদুরি দেখাতে চেয়েছিল। তখন থেকে কেউ তারসাথে কথা বলে না। সে মরার জন্য গলায় ফাঁস

লাগিয়ে তালগাছে ঝুলে থাকল কয়েকদিন। তারপর নিজেই আবার নেমে এসে মাফ চাইল সবার কাছে।'

আমি অবাক হয়ে প্রশ্ন করলাম, 'কয়েকদিন ঝুলে থাকল মানে ?'

ভুত বলল, 'মানে মরার চেষ্টা করল। জেলখানায় ওকে ফাঁসি দিয়ে মেরেছে তো, ভেবেছে গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলে থাকলে আবার মরবে।'

আমি বললাম, 'তারমানে একবার মরলে আর মরার ভয় নেই।'

ভুত বলল, 'একেবারেই না।'

আমি বললাম, 'আচ্ছা ধরে নিলাম তুমি মরে ভুত হয়েছ, কিন' মকবুল তো মরেনি। ওরসাথে বছরখানেক, নাকি বছর দেড়েক আগে ফার্মগেটে দেখা হয়েছে। দিব্যি আমার সাথে গল্প করল। রীতিমত সুস্থ সবল পাজোড়া। বলল মালয়েশিয়া যাচ্ছে। তার পা কাটা গেল কখন আর মারাই বা গেল কখন?'

ভুত বলল, 'সেকথা আমারও মনে আছে। আমিই তোমাকে ডেকে কথা বললাম। তুমি আমাকে নিষেধ করলে মালয়েশিয়া যেতে। তখন সেটা শুনিনি। তারপর মালয়েশিয়া গেলাম। এয়ারপোর্ট থেকে ধরে নিয়ে গেল, আটকে রাখল। দশদিন পর ফেরত প্লেনে উঠিয়ে দিল। আমার পা কাটা গেছে দেশে ফিরে, গাড়ি চাপা পরে। আর মরেছি-'

আমার আর মরার কারন শোনার আগ্রহ হল না। বরং মনটা একটু নরমই হয়ে গেল তার বলার ভঙ্গি দেখে। একেবারেই সেই মকবুলের ভঙ্গি। শব্দের ব্যবহার, উচ্চারন সবকিছু। হয়ত সত্যিকথাই বলছে। শেষবার যখন মকবুলকে দেখি তখন তার চেহারা দেখেও মন খারাপ হয়েছিল। আমি বললাম, 'বেশ, এখন আমি কি করতে পারি বল। টাকাপয়সা খরচ করতে পারব না। একটু আধটু ধান্দাপানি করে যা পাই তার পুরোটাই ঘরভাড়া দিতে চলে যায়। এরপর হাতে কিছু থাকলে খাই না থাকলে পানি খেয়ে থাকি। যদি টাকা পয়সার জন্য এসে থাকো তাহলে আগেই জানিয়ে দিচ্ছি সেটা পারব না।'

মকবুলের পরিচয় দেয়া ভুত বলল, 'আমি তোমাকে বিপদে ফেলতে আসিনি। আর ভুতের টাকাপয়সা প্রয়োজন হয় না। তোমার নিশ্চয়ই মনে আছে আমি যত যাই করি কখনো কারো কাছে হাত পাতিনি। যাকিছু পেয়েছি একমাত্র তোমার কাছেই। কখনো চাইতে হয়নি। সেজন্যই বন্ধু হিসেবে তোমার কাছে একটু দাবী নিয়ে এসেছি।'

আমাকে আরো কাবু করে ফেলল মকবুলের ভুত। আমি মনে করে দেখলাম আসলেই মকবুল কখনো কারো কাছে কিছু চায়নি। এমনকি বাড়িতেও নাকি খিদে পেলে খাবার কথা বলত না। ওকে খাবার জন্য ডাকলে যেত, না ডাকলে না খেয়ে থাকত। আমার কাছে-। না, আমি তাকে বন্ধুত্ব ছাড়া অন্যকিছু কখনো দিয়েছি বলে মনে পরল না। টাকাপয়সা বা কোন জিনিশ তো কখনোই না।

আমি যেন মকবুলের সাথেই কথা বলছি এমনভাবে বললাম, 'আচ্ছা ঠিক আছে। এখন কি করতে হবে বল।'

ভুত বলল, 'আমি তোমার সাথে কদিন থাকতে চাই।'

আমি চমকে উঠলাম। ভুত আমার সাথে থাকবে কিভাবে ? আমার সাথে খাবে ? ঘুমাবে ? ভুতের নিশ্চয়ই খাওয়া ঘুম কোনটাই দরকার হয়না।

জিজ্ঞেস করলাম, ‘সাথে থাকবে মানে কি ?’

মকবুলের ভুত আরো পরিস্কার করে বলল, ‘তোমার সাথেসাথে থাকব, যেখানে যাও সেখানে যাব আর মাঝেমাঝে কথা বলব। অন্য কেউ জানতে পারবে না। আমি সবসময় অদৃশ্য হয়ে থাকব। অন্য কেউ থাকলে কথা বলব না। তোমাকে এসব নিয়ে এতটুকু ভাবতে হবে না।’

আমি বিরক্ত হলাম তার কথা শুনে। মরে ভুত হওয়ার পরও তার মাথায় বুদ্ধি গজায়নি। বললাম, ‘কিন' আমার প্রাইভেসি বলে তো কিছু আছে। সবসময় কেউ আমাকে দেখছে, আমি কি করছি, কারসাথে কথা বলছি, কি বলছি সবকিছু জানছে এটা কি কেউ মেনে নেয়। প্রাইভেসি হল গিয়ে সাংবিধানিক অধিকার। সংবিধান তুমিও পড়নি আমিও পড়িনি তবু দুজনেরই সেটা মানা উচিত। সংবিধান লংঘন হল গিয়ে, সেই যাকে বলে, দেশদ্রোহিতার সামিল। হাজতবাস, রিমান্ড, জেল-জরিমানা থেকে ফাঁসি পর্যন্ত হতে পারে।’

বলতে বলতেই মনেমনে ভাবলাম এজন্য আমাকে অনায়াসে জেলে ঢুকানো সম্ভব, লাঠিপেটা করা সম্ভব কিন' মকবুলের কে কি করতে পারে ? তাকে কোন জেলে রাখবে আর ফাসিই বা দেবে কে ? একটু আগেই তো বলল কে যেন কয়েকদিন গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলেছিল।

মকবুলের ভুত বলল, ‘তোমার সমস্যা হবে এমন কিছু করব না কথা দিচ্ছি। ব্যক্তিগত আলাপেও কান দেব না। তখন দুরে দুরে থাকব।’

আমি বললাম, ‘সেকথায় বিশ্বাস কি ? আমি যখন জানতে পারছি না তখন সেটা করতেও পার।’

মকবুলের ভুত বলল, ‘ঠিকই বলেছ। তাহলে বল দেখি- তোমাদের সরকার যখন ঘোষনা দেয় তোমাদের প্রত্যেকের টেলিফোন আড়ি পাতা হবে, প্রত্যেকের চিঠি খুলে দেয়া হবে, ঘরেঘরে মাইক্রোফোন-ক্যামেরা লাগানো হবে তাহলে কি হইচইটাই না কর তোমরা। যখন না জানিয়ে করে তখন কি কর ?’

আমি মনে মনে বললাম মরে গিয়ে মকবুল অনেক যুক্তি শিখেছে। ওর মুখ থেকে এসব কথা বেরুচ্ছে ভাবাই যায় না। তখনই মনে হল ভুত হয়ত মনের কথাও পড়তে পারে। জিজ্ঞেস করলাম, ‘তুমি কি মনের কথা জানতে পার।’

মকবুলের ভুত বলল, ‘না।’

আমি ঠিক আস্বস- হলাম না। তাহলেও আর কথা বাড়ালাম না। বললাম, ‘বেশ তোমার যদি ইচ্ছে হয় থাকো। কিন' এখন আমাকে ঘুমাতে হবে।’

মকবুলের ভুত বলল, ‘আমি জানতাম তুমি না করবে না।’

আমি ঘুমাতে চেষ্টা করলাম।

সকালে ঘুম ভেঙে বিছানায় শুয়ে থেকে প্রথমেই মকবুলের ভুতের কথা মনে হল। মকবুলের ভুত না, সত্যিকারের মকবুলের কথাই মনে হল আমার। স্কুলে আমার সহপাঠি ছিল। দুজন একই বেঞ্চে বসতাম সবসময়। প্রায়ই পকেট থেকে এটাওটা খাবার জিনিষ বের করে দিত। বইখাতা-কাগজের দাম তখন আকাশছোয়া। সবাই সাদা কাগজ ছেড়ে নিউজপ্রিন্ট পেপারে খাতা বানাতে শুরু করেছে। একবার পেনসিল দিয়ে লিখে দ্বিতীয়বার কলম দিয়ে লেখে কেউ কেউ। এরই মধ্যে মকবুলের খাতায় ঝকঝকে সাদা কাগজ। জলছাপে রেডিও বন্ড লেখা। আমি ওর খাতা থেকে কাগজ খুলে নিয়ে ছবির ওপর ফেলে ছবি আঁকতাম আর সকলের প্রশংসা কুড়াতাম। দেখে মকবুলও হাসত। এতে ওরও কিছুটা ভুমিকা আছে বলে সেও তৃপ্তি পেত।

মকবুল ছিল বেশ মোটা। রীতিমত স্থুল বলা যায়। চলাফেরা করত ধীর গতিতে। ক্লাশের ছেলেরা তো বটেই এমনকি বড়রা-ছোটরা পর্যন্ত সুযোগ পেলে ওকে খোঁচাতে ছাড়ত না। একমাত্র ব্যতিক্রম ছিলাম বোধহয় আমিই। কাউকে খোঁচানো টোচানো আমার একেবারেই অপছন্দ। দুচারবার এনিয়ে অন্যের সাথে কথা কাটাকাটি, এমনকি হাতাহাতিও হয়েছে। একটা ঘটনার কথা পরিস্কার মনে পরছে। মকবুলকে নিয়ে কুকথা বলায় একজনকে ধমক দিলাম আর সে সোজা এসে আমার বুকে ধাক্কা মারল। মকবুল ছিল কাছেই। ওকে যে যাই বলুক সবসময় চোখকান বন্ধ করে শুনে যেত। ঘুরেও তাকাত না। সেদিন, সেই মুহুর্তে আমাকে ধাক্কা মারতে দেখে ও এগিয়ে এল। ছেলেটার সার্টের কলার চেপে ধরল। তারপরই দেখা গেল সে ওর চারিদিকে ঘুরছে। যখন ছাড়া পেল তখন তার নাক দিয়ে রক্ত বেরচ্ছে। যতদুর মনে পরে এরপর ওর ধারেকাছে কম ছেলেই আসত।

ম্যাট্রিকে মকবুল রেজাল্ট খারাপ করল। এরপরই ওর সাথে দুরত্ব বাড়তে থাকল। একসময় ভুলেই গেলাম ওর কথা। তারপর হঠাৎ করেই, এই কিছুদিন আগে একদিন ফার্মগেটে দেখা। ওকে পাশ কাটিয়ে আমি হেঁটে চলে যাচ্ছি, ও হাত ধরে টেনে দাঁড় করাল। হাসিমুখে আমার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'চিনতে পারছ ?'

আমার চিনতে ভুল হল না। বললাম, 'হ্যাঁ, তুমি মকবুল।'

ভাল করে দেখলাম ওকে। এখনও মোটা রয়েছে তবে সেই যৌলুশ নেই তাতে। দেহ যেন বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছে ওর কাছে। চেহারা মলিন হয়ে গেছে। অনেকটা চুল উঠে গেছে। শুধূ হাসিটাই ধরে রেখেছে। জিজ্ঞেস করল, 'কি করছ এখন ?'

আমি বলতে লজ্জা পেলাম। অনেকেই আমাকে নিয়ে অনেক বড়বড় স্বপ্ন দেখত। আমি বড় চাকরী করব, গাড়ি নিয়ে চলাফেরা করব, বড় বাড়িতে বাস করব এইসব। চাকরী আমার ধাতে সয়নি। অন্যকিছু করেও সুবিধে করতে পারিনি। আমি উল্টো প্রশ্ন করলাম, 'তুমি কি করছ ?'

মকবুল বলল, 'মালয়েশিয়া যাচ্ছি। সবকিছু ঠিক হয়ে গেছে। সপ্তাখানেকের মধ্যেই চলে যাব।'

আমি তখন সবধরনের ধান্দাবাজির চেষ্টা করছি। এরই জেরে মালয়েশিয়া ফেরত কিছু মানুষের সাক্ষাৎকার পড়ার সুযোগ হয়েছে। অভুক্ত থাকা, হাড়ভাঙা পরিশ্রম করার চেয়েও আমাকে বেশি পীড়া দিয়েছে তাদের মানষিক কষ্ট। খাঁচায় কোন প্রাণী আটকে রেখে তাকে খোঁচানোর মত।

আমি বললাম, 'যাবে যে, ভালভাবে খোঁজ নিয়ে যেও। শুনেছি ফ্যাক্টরীতে চাকরীর কথা বলে নিয়ে চাষবাসের কাজে লাগায়। গাছপালা কেটে পাথুরে জমিতে চাষ করতে হয়। সাপের কামড় খেতে হয়। আপত্তি করলে ধরে আটকে রাখে, ফেরত পাঠিয়ে দেয়।'

মকবুল একথার কোন উত্তর দিল না। কি উত্তর দেবে সেটা আমিও ভেবে পেলাম না। দুজনেই জানি বাস-বতা কি। একেবারে নিরুপায় হয়ে সে ওপথে রওনা হয়েছে। আমি একথা সেকথা বলে ভদ্রতা রক্ষা করে ওর কাছ থেকে বিদায় নিলাম।

সেই মকবুল স্বপ্নে এসে ওর মৃত্যুসংবাদ জানিয়ে গেল। একসিডেন্টে তার পা হারানোর কথা জানিয়ে গেল। মনটা খারাপ হয়ে গেল আমার। হয়ত ওর কথাই সত্যি। হয়ত সত্যিসত্যিই ও পা হারিয়েছে তারপর মারা গেছে কোন কারনে।

একসময় সব আবেগ ঠেলে ফেলে উঠলাম। যত যাই হোক, অন্তত একটা কাজ আমার হাতে রয়েছে। একযায়গায় হাজিরা দিয়ে কলম পিষতে হয়। সেটাও হারালে অবস্থা মকবুলের মতই হবে।

হাতমুখ ধুয়ে জামাকাপড় পরে ঘরে তালা লাগিয়ে বের হলাম। পকেটে রয়েছে একটামাত্র পঞ্চাশ টাকার নোট। হাতে কবে টাকা আসবে ঠিক নেই। এই টাকা দিয়ে খাওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে, যাতায়াত করতে হবে। মনে হচ্ছে সকালে এককাপ চা ছাড়া অন্যকিছু জুটবে না। তারও যা দাম। দুধের দাম বেশি, চিনির দাম বেশি, কেরসিনের দাম বেশি। মনেহয় চা খাওয়া ছেড়ে দিতে হবে।

মোড়ের চায়ের দোকানের দিকে হাঁটতে হাঁটতে মকবুলের কথা ভুলেই গেলাম। ইচ্ছে করলে এই দোকানে বাকি রাখা যায়। সাধারনত বাকি রাখি না, সেকারনেই বাকি রাখতে চাইলে আপত্তি করে না। আজ থেকে কয়েকদিন যাকিছু খাব সব বাকিতে। শুধু চা-ই না, প্রয়োজনে সকালের নাস্তাও খেয়ে নেয়া সম্ভব। বিস্কুট, পাউরুটি, কেক, কলা সবকিছুই বিক্রি হয়।

একজন ধাক্কা মেরে আমার চিন্তা বন্ধ করে দিল। কোনমতে থাক্কা সামলে পতন রক্ষা করে ঘুরে দেখলাম তাকে। মকবুলকে এর তুলনায় রোগাই বলতে হয়। থপথপ করে হাঁটছে। পড়নের প্যান্টটা ইঞ্চিদুয়েক নামলে খসে পড়বে। সার্ট বা গেঞ্জি যা-ই বলি না কেন সেটা প্যান্ট থেকে কয়েক ইঞ্চি উচুতে। হাতে কিছু একটা রয়েছে। সেটা কি দেখতে পেলাম না তবে মাঝে মাঝে মুখে দিচ্ছে। মনে হয় মোটা হতে যেটুকু বাকি আছে সেটা পুরন করছে। আমাকে যে ধাক্কা দিয়ে ঘুরিয়ে দিয়েছে সেটা টের পায়নি। হেঁটে রাস্তার পাশেই যে ডাষ্টবিন ততদুর চলে গেছে।

আমার ভীষন রাগ হল। এরা পেয়েছে কি ? চুরি বাটপারি করে টাকা কামাবে, জিনিষপত্রের দাম বাড়াবে আবার রাস্তাঘাটেও অন্যকে ধাক্কাগুঁতো দিয়ে চলবে। উচিত শিক্ষা হত যদি-

আমি চিন্তা শেষ করার সময়ও পেলাম না। দেখলাম একেবারে আমার চোখের সামনে তার দুপা সামনের দিকে উচুতে উঠে গেল আর সে দড়াম করে আছড়ে পরল। একেবারে ডাষ্টবিনের ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা ময়লার ওপর। এতক্ষনে দেখতে পেলাম তার হাতে ছিল কলা। অর্ধেকের বেশি খেয়ে ফেলেছে। এখন হাত থেকে ছুটে সেটা পরে আছে রাস্তায়। তাড়াহুড়ো করে উঠতে গিয়ে পা দিল তারই ওপর, ফলে আরেকবার।

আমি আর কিছু দেখা প্রয়োজন মনে করলাম না। ঘুরে নিজের কাজে রওনা দিলাম।

এই চায়ের দোকানে আমি নিয়মিত খদ্দের। সম্ভবত আমার মত নিয়মিত খদ্দের আরেকজন নেই। কখনো কোন টাকা পয়সার ঝামেলা নেই। আজ হঠাৎ করেই আমাকে দেখে দোকানদার ব্যস- হয়ে উঠল, 'আরে আসেন বস। আসেন। আইজ আপনের জন্য ফ্রি।'

আমি থমকে দাঁড়ালাম, 'ফ্রি মানে ?'

দোকানদার বলল, 'ফ্রি মানে ফ্রি। ট্যাকা তো সারা বছরই দিলেন। একদিন ফ্রি খান।'

আমি বললাম, 'কিন্তু আমার তো শুধু চা খেলে চলবে না। সকালের খাওয়া হয়নি। তার কি হবে ?'

দোকানদার বলল, 'আরে বস, এইডা কোন কথা হইল। এই ভাল দেইখা কলা আন। এই যে বস, এই কেকটা খান। খুব ভাল কেক।'

একেবারে ঝকঝকে একটুকরো কেক আর কলা আমার হাতে পৌছে গেল। আমি আর বাক্যব্যয় না করে সবচেয়ে ভাল কলা, কেক খেতে শুরু করলাম। একজন ঝকঝকে গ্লাশে করে পানি এনে কাছে দাঁড়াল। খাওয়া শেষ হতে না হতেই চা তৈরী। অন্যদিন কাপে যে একআধটু ময়লা দেখা যায় আজ তাও নেই। একেবারে চকচক করছে। আমি নির্বিকার ভাব মুখে এনে চা খেতে থাকলাম আর দৃষ্টি বুলিয়ে বোঝার চেষ্টা করলাম বিষয়টা কি। অন্যদিনের থেকে পৃথক কিছুই আমার নজরে এল না। খাওয়া শেষ করে উঠে দাঁড়ালাম। শুরুতেই বলেছে টাকা দিতে হবে না, তাহলেও অন্তত ভদ্রতা রক্ষার জন্য আমার কিছু করা উচিত। পকেটে হাত ঢুকাতে ঢুকাতে বললাম, 'আমার বিল কত ?'

দোকানদার মন খারাপ করে বলল, 'এইডা কোন কথা কইলেন বস। কইলাম ট্যাকা লাগব না। মানুষ গরীব হইলে কি হইছে বস, আমাগোও মন আছে। গরীবের মনে ব্যথা দিয়েন না।'

'আচ্ছা।'

বলে গরীবের মনে আর ব্যথা না দিয়ে আমি সরে গেলাম সেখান থেকে। আর দেরি করা চলে না। ফ্রি খাওয়ানোর উপলক্ষ জানার চেষ্টাও করলাম না। এমনিতেই পরে কোন একসময়ে জানা যাবে। লোকে বলে দুদিনের চাঁদ ঘরে বসেই দেখা যায়। এখন আমাকে ঠেলাঠেলি করে বাসে উঠতে হবে। সোজা সেদিকেই রওনা হলাম।

এইসময় বাসে ওঠার জন্য কতক্ষন অপেক্ষা করতে হয় তার কোন ঠিক নেই। কখনো কয়েক মিনিট কখনো কয়েক ঘন্টা। আজ বাসষ্ট্যান্ডে পৌছতেই দেখলাম একটা ফাঁকা বাস। ফাঁকা বলতে অবশ্য দাঁড়ানোর যায়গা ফাঁকা। বসার যায়গা পাওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই। এই বা কজনের ভাগ্যে জোটে। গাড়ির গতি কমার সাথেসাথে দৌড়ে এসে উঠে দাঁড়ালাম ভেতরের রড ধরে। সামনের ফাঁকা যায়গা দেখতে দেখতে ভরে গেল। নতুন ওঠা যাত্রীদের ধাক্কা খেতে খেতে আমি ক্রমেই পিছনের দিকে যেতে থাকলাম। তবে তাতে আমার আপত্তি নেই। বরং পিছনের দিকে ধাকাধাক্কি কম। আমি মোটামুটি সোজাভাবেই দাঁড়ানোর যায়গা পেলাম।

বাসে ঝগড়াঝাটির সাথে আমার পরিচয় নিত্যদিনের। এর কাছে টাকা নেই, ওর কাছে খুচরো নেই, সে বলছে পরে দেবে। কারো পকেটে হাত ঢুকানোর সুযোগ নেই, কারো পকেট কাটা গেছে। বাসের লোকের সমান সমান উত্তর। সে এই সবগুলো ব্যাখ্যার সাথেই পরিচিত। সবগুলোর জন্যই উত্তর রেডি।

আজ অবশ্য নতুন কথা শুনতে পেলাম বাসের লোকের মুখে। কয়েকবার শোনার পর আমি বুঝতে পারলাম তার কথা, 'কাহিনী কইরেন না।'

যে যাই বলুক না কেন, তার মুখে এক কথা, 'কাহিনী কইরেন না।' টাকা নেই শুনলেও এককথা, খুচরো নেই শুনলেও এককথা, পরে দেব শুনলেও এককথা, ষ্টাফ শুনলেও এককথা, ছাত্র শুনলেও এককথা।

দেখলাম সে কাহিনী করতে নিশেধ করতে করতে আমার পাশ দিয়ে ভীড় ঠেলেঠুলে পিছনে চলে গেল, আবার ভিড় ঠেলে সামনের দিকে গেল। আমি টাকা বের হরে হাতে এনে রাখলাম চাহিবামাত্র দেবার জন্য। সে আমাকে ওভারটেক করে গেল। আবারও গেল পিছনদিকে, আবারও সামনের দিকে। আমাকে যেন দেখতেই পেল না।

এদিকে আমার নামার সময় হয়ে গেছে। মোড়ের এপাশে সিগন্যাল পেলে আমি নেমে পরব। নয়ত রাস্তা পার হতে আধঘন্টা। দেখতে পেলাম সিগনাল হলুদ হয়েছে, গাড়ির গতি কমছে, থামছে। আমি ভিড় ঠেলে সামনের দিকে এগোতে চেষ্টা করলাম। সে যখন ভাড়া চায়নি তখন আমাকেই যেচে দিতে হয়। অনেক কষ্টে গেটের কাছে পৌছে দেখলাম সে নিচে দাঁড়িয়ে নেমে যাওয়া লোকদের কাছে ভাড়া চাইছে আর বলছে, 'কাহিনী কইরেন না।'

সামনের সকলে নামার পর আমি নামার সুযোগ পেলাম। নেমেই দেখি যে পিছনদিকে যাচ্ছে। তাকে ধরার জন্য আমিও রওনা হলাম। সে বাসের পিছনদিকে দিয়ে ঘুরে পুরো বাসে চক্কর দিয়ে অন্যদিকে দিয়ে সামনে এগোতে লাগল। আমিও অনুসরন করলাম তাকে। তাকে প্রায় ধরে ফেলব এমন সময় বাস নড়তে শুরু করল। সে দৌড়ে চলে গেল সামনে দিয়ে। আমি অত সাহস পেলাম না। কোনমতে পিছনের বাসের হাত থেকে রক্ষা পেয়ে রাস্তার পাশে এসে দাঁড়ালাম। আর সে শেষবারের মত 'কাহিনী কইরেন না' বলে নিজেই এক কাহিনী তৈরী করে চলে গেল।

পকেটে পুরো পঞ্চাশ টাকা নিয়েই আমি অফিসে প্রবেশ করলাম। নিজের রুমের সামনে গিয়ে থমকে দাঁড়াতে হল আমাকে। ঘর ধুলোয় ঢেকে আছে। আবছাভাবে নড়াচড়া দেখা যাচ্ছে ভেতরে। নিজের টেবিলের দিকে চেয়ে দেখলাম কেউ বুদ্ধি করে খবরের কাগজ দিয়ে ঢেকে রেখেছে সবকিছু। পাশের টেবিলেরও একই অবস্থা। আর সেখানে বসে রয়েছে শাড়ীপড়নে একজন পুতুল।

বিষয় বুঝতে সময় লাগলনা। আমার দুপাশের দুজন বিদেয় নিয়েছে বেশ কদিন হল। একজন তিনমাসের বেতন বাকি রেখে, আরেকজন কত মাসের জানিনা। কদিন আগে ইন্টারভিউয়ের জন্য ভীড়ও চোখে পরেছে। তারই ফল ফলেছে আজ। নতুন অতিথির সাথে ঘরের চেহারাও পাল্টানো হচ্ছে। আমি বিন্দুমাত্র দেরি না করে হাজিরা খাতার দিকে রওনা হলাম।

'এই যে, আইয়া পরছেন।'

ট্রেডমার্ক বাক্য শুনে ঘুরে দেখলাম আকবর তার ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে। আকবর চলনে বলনে সম্রাট আকবরের মতই। একা এক রুমে বাস করে। পুরো অফিস দাপিয়ে বেড়ায়। যাকিছু খাওয়াদাওয়া করে তার পুরোটাই শরীরে জমা হয়। সেবিষয়ে তার কোন লুকোছাপা নেই। সরাসরিই বলে, 'যদি গায়েগতরে না লাগল তাইলে এত দামী খাবার খাইয়া লাভ কি ?

কচুঘেচু লতাপাতা খাইলেই তো চলে। দেহেন না মন্ত্রী মিনিষ্টারগো। মন্ত্রী হওনের সাথেসাথে চেহারা পাল্টাইয়া যায়।'

আমি একবার বলেছিলাম, 'কিন' আপনি তো মন্ত্রী মিনিষ্টার নন। শুধু শরীরে তাদের মত হলে কি চলবে ? তারা কত কাজ করে। সকাল দুপুর রাত সবসময় তারা মিটিং নিয়ে ব্যস-। সবসময় তাদের টিভিতে দেখা যায়। ঘুমোবার সময় পর্যন্ত নেই সেকথা কি জানেন।'

আকবর আপত্তি করে বলেছিল, 'আপনে ওইসব কথায় কান দেন ? আমি ঘুমাই না। এইগুলান একেবারে মিছা কথা। দুপুরে একটু রেষ্ট নেই কইতে পারেন। চক্ষু বুইজা চেয়ারে হেলান দিয়া রেষ্ট। চার্চিল না-কি কোন আমেরিকান প্রেসিডেন্ট কইছে সময় পাইলে ঘুমাইতে। রেষ্ট নিতে। খাড়াইয়া, বইসা, শুইয়া, যেমনে পারেন। তাইলে না কাজ করনের এনার্জি থাকে। আর মন্ত্রী মিনিষ্টার হমুনা এইডা কন ক্যান ? হেরা কি মন্ত্রী মিনিষ্টার হইয়া জন্মাইছে ? হেরাও একদিন আমার মতই আছিল। আমার চাইতে খারাপ অবস্থা আছিল। তারা হইলে আমি হমুনা ক্যান ?'

সেদিন আমাকে তার কথায় সায় দিয়ে সরে যেতে হয়েছিল। সেই আকবর দি গ্রেট সেই দন্তবিকসিত হাসি নিয়ে এগিয়ে এল আমার দিকে, 'আরে আপনের রুমে তো এলাহি কারবার। মনেহয় বিয়া লাগছে।'

আমি বললাম, 'কার, আপনার নাকি ?'

আকবরের হাসি আরো বিকশিত হল, 'কি যে কন না এত লোকের সামনে। শোনেন, কামডাতো একা আপনেই বাকি রাখছেন। আর সকলের কমপ্লিট।'

আমি বললাম 'হুঁ।'

আকবর বলল, 'খাম্বার মত খাড়ায়া থাকলেন যে। দ্যাহেন না গিয়া কি করতাছে।'

আমি বললাম, 'আমার ধুলোবালি একেবারে সহ্য হয় না। ওখানে গেলে দম নিতে পারব না।'

আকবর তার হাসির যেটুকু বাকি ছিল সেটা পুরন করল, 'কন কি ? এই বয়সে হাপানি বানায়া ফালাইছেন ? এইডা আবার কি রোগ রে বাবা। রোগ হইলে হয় ডায়াবেটিস নয় হার্টের ব্যারাম। বড়লোকি রোগ। মাঝেমাঝে ক্যালকাটা ব্যাংকক ঘুইরা আসবেন দ্যাখবেন রোগ ফিনিশ। তাইলে চলেন আমার রুমে একটু বইসা যান। বশির দুইডা চা দাও তাড়াতাড়ি।'

রীতিমত আমার হাত ধরে টেনে নিয়ে গেল তার বসার ঘরে।

এই ঘরটা আমার ভারি পছন্দ। আমি বেশ কয়েকবার ঘরটা পাওয়ার চেষ্টা করেছি। হিসেবে সেটা আমার পাওনা কিন' কখনোই আকবরকে টেক্কা দিতে পারিনি।

আকবর তার বিশাল চেয়ারে বসে দুলতে শুরু করল। আমি বসলাম সামনের চেয়ারে। ঘরের জানালায় দামি পর্দা ঝুলছে, বাতাসে সুগন্ধ, বিশাল টেবিল সুন্দরভাবে সাজানো। বিশাল চেয়ারে বিশাল আকবর বসে। মনে হল আমি বসের সামনে বসে রয়েছি।

আকবর বলল, 'আসলে কথা কি জানেন। কখনো একা থাকতে নাই। একা থাকলেই মনে কতরকম চিন্তা ঘুরপাক খায়। এইডা মন চায়, সেইডা খারাপ লাগে। আপনে তো কাগজ থিক্যা চোখই তোলেন না আপনারে বুঝাই ক্যামনে। মাঝেমাঝে আসতে তো পারেন।'

এটা কোন আলাপের সুচনা আমি ঠিক বুঝলাম না। তাকে পরখ করার জন্য আন্দাজে ঢিল ছুড়লাম, 'আপনার রুমটা বেশি ছোট। একটু বড় হলে আরেকটা টেবিল বসানো যেত। কথা বলার একজন মানুষ পেতেন।'

আকবর ঘাড় ঘুরিয়ে রুমটা আরেকবার দেখে বলল, 'দেখেন না চেষ্টা কইরা। যদি একটা টেবিল দেওয়া যায়। আপনের ওখানে খুব বেশি চাপাচাপি। একজনরে এইখানে দিতে পারলে সবকিছু মানানসই হয়। এই কাঠের বাক্সডা সরাইলে যায়গা হয় না ? এইডাতো আমার কোন কামে লাগে না। নিবেন নাকি এইডা ? আপনের তো অনেক কাগজপত্র। নাহয় এইখানে রাখবেন।'

আমি রুমটা আরেকবার চোখ দিয়ে মেপে নিয়ে বললাম, 'তাহলেও সমস্যা হবে। আপনার টেবিলটা এত বড়। আর এটা যে বদল করবেন তাও তো হবে না। দরজা দিয়ে বের হবে না। দেয়াল ভাঙতে হবে। বাড়িঅলা বোধহয় সেটা করতে দেবে না।'

আকবর চোখ কপালে তুলল, 'কন কি! তাইলে এইডা ঢুকাইছে ক্যামনে ?'

আমি বললাম, 'মনেহয় ঘরের ভেতরেই জোড়া দিয়েছে। রাজসিক কারবার তো।'

আকবর হে-হে করে হাসল কিছুক্ষন। বশির এসে চা রেখে গেল টেবিলে। আকবর একটা কাপ তুলে একচুমুক খেয়ে মাথা ঝাঁকাল, 'তাইলে কি খাড়াইল ? কোন সমাধান নাই ?'

আমি মনেমনে বললাম এইবার একটা চেষ্টা নেয়া যাক। কোনমতে যদি তাকে এখান থেকে বের করা যায় তাহলে আমার প্রতিদ্বন্দ্বি নেই। মুখে বললাম, 'সমাধান একটা করা যায়। যদি আপনি নিজেই বড় রুমে যান। সেখানে সঙ্গিসাথি পাবেন।'

আকবর কিছুক্ষন চুপ করে থাকল কথা শুনে। তারপর আমাকে অবাক করে দিয়ে বলল, 'কথাডা খারাপ কন নাই। অনেকদিন তো এইহানে কাটাইলাম। ভাবতাছি।'

মনে হল মাছ টোপ গিলছে। এখনই সময় যা কিছু করার। আমি বললাম, 'একটু তাড়াতাড়ি ভাবুন। সময় তো বেশি নেই।'

আকবর অবাক হয়ে বলল, 'ক্যান, সময় নাই ক্যান ?'

আমি বললাম, 'না, মানে- একজনকে তো দেখলাম বসে রয়েছে ধুলার মধ্যেই। আরেকজনও বোধহয় এসে যাবে। ওরা যদি জানে আপনি আগে এখানে বসতেন পরে যায়গা পাল্টেছেন তাহলে ভাববে ওদের জন্যই। এই আরকি। মানুষের মন তো। সবসময় খারাপটাই আগে ভাবে। কেউ কি কারো ভালো দেখে বলুন ?'

আকবর বলল, 'হ, ঠিকই কইছেন। তাইলে কি করতে কন ?'

আমি সরাসরি বলেই ফেলাম, 'এখন তো ঝাড়ামোছার কাজ চলছেই। এইফাঁকে যদি এই কাজটাও সেরে ফেলা যায় তাহলে কারো চোখেই পরবে না। এককাজে দুই কাজ। সাপও মরল লাঠিও ভাঙল।'

আকবর আরেকটু ভেবে নিয়ে বলল, 'কিন' আপনে যে কইলেন টেবিল বাইর করন যাইব না।'

আমি বললাম, 'আরে টেবিলটাই কি সবকিছু। আপনি হলেন আকবর। দি গ্রেট। মহান আকবর। আপনার চেহারাই সবকিছু। দেখুন তো অফিসের কেউ আপনার পাশে দাড়িয়ে পাত্তা

পায় কিনা। বশিরকে বললে মুহূর্তের মধ্যে কাজ করে ফেলবে। আমার শুধু টেবিলের কাগজগুলো হলেই চলবে। আর ড্রয়ারে কয়েকটা কলম। ওগুলো ভুললে কিন' সমস্যা।'

আকবর যেন একেবারে আকাশ থেকে পড়ল, 'কলম! কলম লাগব আপনের। এই যে দেহেন বলপেন, জেলপেন, পাইলট, পার্কার, সেফার্ড সব রইছে। যত মন চান নিয়া যান। এইসব কলম মানুষ ব্যবহার করে আজকাল ? এই যে দেহেন না চেহারাডা, মনে হয় এইডা কলম ?'

সবুজ রঙের সেফার্ডটা একরকম ছুড়েই দিল আমার দিকে। আমি এই জিনিষ এতদিন শুধু অন্যকে ব্যবহার করতেই দেখেছি। দোকানে দাম জিজ্ঞেস করার সাহসও পাইনি কখনো। বিন্দুমাত্র কালক্ষেপন না করে সেটা তুলে নিলাম হাতে। আকবর ততক্ষনে আরেকটা কলম হাতে নিয়েছে, 'এই যে দ্যাহেন। এইডা হইল কলম। দ্যাখছেন গন্ধডা, মনে হয় খাবার জিনিষ। একদিন মুখে দিয়া দ্যাখছিলাম, কোন স্বাদ নাই। ক্যান রে বাবা, একটু টকমিষ্টি দিলে কি সমস্যা ছিল। দাম কতই বাড়ত। লোকে ক্যামনে যে ব্যবসা করে আমার মাথায় ঢুকে না। টক-ঝাল-মিষ্টি দিয়া এমুন একটা কলম বাজারে ছাড়লে কতকোটি টাকা যে কামান যাইত।'

আফশোসে মুখ দিয়ে চুকচুক শব্দ করল আকবর।

আমি বললাম, 'বসকে বলে দেখুন না। তার তো আবার সব ব্যবসায় নাক গলানোর স্বভাব আছে। যদি হয়েই যায় আপনি হবেন কোম্পানীর চিফ এডভাইজার।'

আকবর বলল, 'হ্যারে বুদ্ধি দিলে আমার লাভ কি ? আমারে মাস মাস গোনা ট্যাকার বাইরে এক ট্যাকাও দিব না। ভাবতাছি নিজেই কিছু করন যায় কিনা। আমার এক দুলাভাই আছে ব্যাংকের ডিরেক্টর। হ্যার সাথে আলাপ কইরা দেহি যদি লোন বাগান যায়। আপনে আবার কাউরে এইসব কইয়েন না।'

আমি রীতিমত বিনয় দেখিয়ে বললাম, 'আরে না-না। আপনি শিল্পপতি হবেন, মন্ত্রী হবেন। হলেই তো আমার মত মানুষের লাভ। অন্যমন্ত্রীর চেহারা তো টিভি ছাড়া দেখা যায় না। আপনি মন্ত্রী হলে অন্তত সে সুযোগটা পাব। অবশ্য আপনি যদি ওদের মত বদলে না যান।'

আকবর হে হে করে হাসতে শুরু করল, 'কি যে কন না। আপনেরে ভুললে চলব ক্যামনে। আপনে হইলেন গিয়া সাদাসিদা মানুষ। কারো সাতেও নাই পাচেও নাই। সাত আর পাচে কত হয় ? বারো। আপনে কারো এক ডজনের মইদ্যে নাই।'

আমি আর সময় নষ্ট না করে বললাম, 'তাহলে বশিরকে ডেকে দিই। ও জিনিষ বদলাবদলির কাজটা করে ফেলুক। আর আপনিও ওখানে থাকুন। আপনি হলেন বস মানুষ। একে ওকে ধমক টমক দেবেন। প্রথম দিনেই বেড়াল মারতে হয় শোনেননি। প্রথম দিনেই জানিয়ে দিন আপনি বস। আমি ততক্ষনে বাইরে থেকে একটু ঘুরে আসি।'

আকবর বলল, 'আবার বাইরে কই যাইবেন। বশিররে কন আরেক কাপ চা দিব। এইহানে বইসা খান।'

আমি তাড়াতাড়ি বললাম, 'না-না। আমি বরং বাইরে থেকে ঘুরে আসি। একটু হাঁটাহাটি করা হবে। আমার আবার হাঁটাহাটি না করলে পা ব্যথা করে। সারাজীবনের অভ্যেস।

আকবরকে আরকিছু বলার সুযোগ না দিয়ে বাইরে রওনা দিলাম। পিছন থেকে শুনতে পেলাম আকবর বলছে, 'আপনারে অশেষ ধন্যবাদ। এন্ডলেস থ্যাংকস।'

আকবরের মতিগতি বোঝার উপায় নেই। যে কোন সময় সিদ্ধান্ত পাল্টাতে পারে। কলমটা পকেটে রাখতে ভূল করিনি।

অকারনে এদিক ওদিক হাঁটলাম কিছুক্ষন। এইসময় হাঁটাহাটি ঠিক মানায় না। মানুষজন সবেমাত্র দিন শুরু করছে। মানুষ এখনো কর্মস্থলে যাচ্ছে, ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান খুলছে, ফুটপাতের দোকানপাট চালু হচ্ছে। এখনও সকলে তরতাজা। সত্যিকারের হাঁটাহাটির মজা বিকেলে। অফিস ফেরতা মানুষ, বেড়াতে বের হওয়া মানুষ সবাই সত্যিকারের চেহারা নিয়ে ধরা দেয়। এখন সেটা নেই। একযায়গায় সামান্য ভিড় দেখে সেদিকেই এগিয়ে গেলাম।

রাস্তার পাশেই একজন পীর বসে রয়েছেন। আমার অন্তত তার বেশভুষা দেখে পীর বলেই মনে হল। মনেহয় নতুন আমদানি। আগে কখনো দেখিনি। বসে রয়েছেন ফুটপাতের ওপর। গায়ে চট জড়ানো। আশেপাশে আরো কয়েকজন, মনেহল শিষ্য। অন্তত দুজনকে দেখে মনেহল তারা এসেছে পরামর্শের জন্য।

আমি শুনেছি অনেক সন্যাসী, পীর-ফকিররা দোয়া তাবিজ দেন। ইনি বোধহয় হাতও দেখেন। একজন তার নিজের হাতের দিকে যেভাবে তাকাচ্ছে তাতে মনেহল এইমাত্র হাত দেখানো শেষ হল। সে একটা দশটাকার নোট রেখে পীরের পদধুলি নিয়ে চলে গেল। দেখলাম কাছেই থামিয়ে রাখা রিক্সা নিয়ে গেল। নিশ্চয়ই সেটা তার।

আরেকজন এগিয়ে গেছে। হাত দেখাবে বোধহয়। আমি কাছে সরে এলাম। পছন্দ হলে নিজের হাতটাও একফাঁকে দেখিয়ে নেব।

হাতের দিকে তাকিয়ে পীরমশাই নানারকম প্রশ্ন করছেন। আমি মনোযোগ দিয়ে তাদের কথোপকথন শুনতে লাগলাম।

‘নাম ?’

‘আকলাক।’

‘আকলাক না, আখলাখ। নাম পবিত্র জিনিষ, এর বিকৃতি করতে নেই। সমস্যা কোথায় ? ব্যবসা ভাল যাচ্ছে না ?’

‘জ্বে। হুজুর তো সবই জানেন। পরপর তিনবার লস খাইছি। অহন হুজুরের দয়া।’

‘আমার কিছু করনীয় নেই। সব তার ইচ্ছা। আমরা উছিলা মাত্র। কি ব্যবসা করতে ?’

‘কোনকিছুই তো বাদ রাখিনাই হুজুরসাব। যেহানে হাত দেই সেহানেই ঠক খাই।’

‘ইক্ষু ব্যবসা করেছ ?’

‘জ্বে ইক্ষু !’

‘হ্যাঁ, ইক্ষু। গেন্ডারি।’

‘জ্বেনা।’

‘তোমার নামটাই বলে দিচ্ছে তোমার ভবিষ্যত। সবই আল্লার ইচ্ছা, আল্লার কেরামত। আখ হইল ইক্ষু, গেন্ডারি। আর লাখ মানে লক্ষ। তুমি গেন্ডারি ব্যবসা করে লক্ষটাকা কামাতে পারবে।’

‘ইক্ষু ব্যবসা করতে কন ?’

‘আমি কিছু কই না। সব তার ইচ্ছা। তিনি যেভাবে চালান সব সেভাবেই চলে। তার হুকুম ছাড়া গাছের পাতা নড়ে না।’

‘অ, ইক্ষু কি আছিলা দিমু না রস বাইর করুম।’

‘আচ্ছা, হাতটা দেহি-’

তিনি হাত টেনে নিয়ে চোখ বন্ধ করলেন। শুনেছি জ্যোতিষীরা হাতের রেখা দেখেন। রেখায় লেখা থাকে অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যত। কবে বিয়ে হবে, কবে ভাগ্য ফিরবে, বিদেশ যেতে পারবে কিনা। মুখ দেইে বলে দেব- পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেখেছি। এর মনে হয় চোখমেলে দেখা প্রয়োজন হয়না। হাতে হাত ধরেই রেখা পড়তে পারেন।

তাকে ইক্ষু কিভাবে বিক্রি করতে বললেন সেটা শোনার সুযোগ পেলাম না কারন ততক্ষনে আমার মনোযোগ গেছে অন্যদিকে। পুলিশের পোষাক পড়নে তিনজন এসে দাঁড়িয়েছে সেখানে। একবার ভাবলাম অবৈধ ব্যবসা করার কারনে প্রশ্ন করবে। সেটা করতে না দেখে ভাবলাম হয়ত ট্যাক্স দিতে হবে। আশেপাশে লোকজন দেখে ইতস-ত করছে। ফুটপাতে ব্যবসা করলে সরকারকে ট্যাক্স দিতে হয়। আমাকে একেবারে অবাক করে দিয়ে একজন এগিয়ে গিয়ে তার হাত বাড়িয়ে ধরল।

আমি সবকিছু শিখি খুব দেরিতে। বহুবার নিজেকে সাবধান করেছি সামনে যাকিছু ঘটুক শুধু দেখেই যাব। কখনো কিছু বলব না। চোখ খোলা, কান খোলা, মুখ বন্ধ। সব জ্ঞানী লোক এইকথা বলে গেছেন। তাদের লেখা বই লক্ষ লক্ষ কপি বিক্রি হয়। এই উপদেশ শুনে কে কোন চুড়ায় উঠেছেন তার বর্ননা থাকে। মুলকথা একটাই, যা যা করে তাতে সায় দিয়ে যাবেন। তার মন জয় করবেন।

কিন' বহু বিব্রতকর অবস্থায় পরেও আমি সেটা শিখতে পারিনি। অযাচিত উপদেশ দিতে গেছি। এবারেও সেটাই ঘটল। আমি যেচেই উপদেশ দিতে গেলাম হাতদেখানো পুলিশকে। আমি মুখ খুলতেই পুলিশ জিজ্ঞেস করল, ‘আপনে কি করেন ?’

এর উত্তর দেয়া আমার পক্ষে সত্যিই কঠিন। বহুজনকে বলার চেষ্টা করেছি। যতটা বলেছি তারচেয়ে বেশি ব্যাখ্যা দিতে হয়েছে। কেউ সব শুনে ঠোট উল্টে বলেছে, ‘অ’। অনেককে সে পর্যায়েও নিতে পারিনি। একে কিভাবে বুঝাব আমি কি করি?

আমি বললাম, ‘রাস্তায় মানুষ গুনি।’

দুজনে মুখ চাওয়াচাওয়ি করল। কি কথা হল জানি না তবে বুঝলাম আমার উত্তর পছন্দ হয়নি। তাদেরকে সন্মান করে কথা বলা উচিত ছিল। অন্তত আমার পড়নে যখন হাজার টাকার পোষাক নেই, চেহারাও তেমন খুবসুরত না। তাহলে পুলিশের সাথে মস্কারি করার খেসারত আমাকে দিতেই হয়। লোকে বলে বাঘে ছুলে আঠার ঘা, পুলিশে ছুলে ছত্রিশ।

আমাকেও তাই করতে হল। ওদের সাথে থানার পথে রওনা হলাম। পথে পকেট থেকে পঞ্চাশ টাকার নোটটা আর আকবরের কাছ থেকে নেয়া কলমটা উধাও হয়ে গেল।

থানায় আমাকে যার সামনে আনা হল তাকে দেখে আমি ঘাবড়েই গেলাম। ওজনে অন্তত আমার মত সাড়ে তিনজন। লম্বাই চওড়াই কোন দিকেই তুলনা পাওয়া কঠিন। হলিউডের এক ছবিতে দেখা নাইজেরিয়ান জেনারেলের কথা মনে পড়ল আমার। সামনের টেবিলে দুহাতের কনুই ঠেকিয়ে ঝুঁকে বসে রয়েছে। হাতের কাছেই একছড়া কলা। একেবারে ছোট ছোট, হাতের আঙুলের সমান। আমার খুব প্রিয় এই কলা। দেশিয় ঐতিহ্য বোধহয় একমাত্র এতেই টিকে রয়েছে। এখনও স্বাদ-গন্ধ পাওয়া যায়।

আমি তার সামনে, টেবিলের উল্টোদিকে বসলাম। তিনি অপলক কিছুক্ষন তাকিয়ে থাকলেন আমার দিকে। আমার বুকের ভেতর শিরশির করে উঠল তাতে। তক্ষুনি কি যেন অনুভব করলাম। আশেপাশে চেয়ে দেখলাম আমার সামনে বসা জেনারেল আর আমি ছাড়া কেউ নেই।

মকবুল বলেছিল আমার কাছাকাছি থাকবে।

আমার ভয় মুহূর্তে চলে গেল। মকবুলের ভুত যার সঙ্গি তার ভয় কিসে ? ভুতের সাথে মামদোবাজি চলে না। পুলিশ তো পুলিশ।

আমার সামনের ব্যক্তি একটা কলা ছিলে খোসাটা বামহাতে ছুড়ে দিলেন। তার বামদিকে দেয়াল ঘেঁসে একটা বাতিল কাগজ ফেলার ঝুড়ি। সম্ভবত সেটাই তাক করেছিলেন কিন' ফস্কে গেল। আমি চেয়ে দেখলাম সেখানে অনেকগুলো খোসা জমেছে। কোনটা ভেতরে গেছে, কোনটা ঝুলে রয়েছে গায়ে। আর বাকিগুলো মেঝেতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে আশেপাশে।

ডানহাতে রাখা কলাটা টুপ করে মুখের মধ্যে দিয়ে বোধহয় গিলে ফেললেন। সেখান থেকে আওয়াজ বেরুল, 'নাম কি ?'

আমাকেই জিজ্ঞেস করেছেন। নাম জানালাম।

'করেন কি ?'

আবারও একই প্রশ্ন। আমি যে কাজ করি তার ব্যাখ্যা দিতে গেলে কয়েক ঘন্টা ব্যয় করতে হয়। তারপরও তাকে বুঝানো যাবে না আসলে কাজটা ঠিক কি। আমি সরলপথেই যাওয়ার চেষ্টা করলাম।

বললাম, 'চাকরি করি।'

আবার প্রশ্ন এল, 'কি চাকরি ?'

কি মুসিবত রে বাবা। কি চাকরি সেটা কি করে বুঝাই। এই চাকরির যে কোন পদবি নেই। কাজ করে দেই, টাকা পাই। ব্যাস।

হঠাৎ করে বুদ্ধি এসে গেল মাথায়। বললাম, 'ম্যানেজার।'

মনেমনে বললাম একেবারে লাগসই উত্তর দিয়েছি। প্রধানমন্ত্রিও ম্যানেজার, পকেটমারও ম্যানেজার। একজন দেশ ম্যানেজ করে একজন পকেট ম্যানেজ করে। ম্যানেজার নামের মধ্যে একধরনের কোটটাই পরা ভাব থাকে। এসব যায়গায় নাকি সেগুলো কাজে আসে।

নতুন প্রশ্ন এল এবার, 'কি করছেন ?'

প্রথমে বুঝে উঠলাম না কি করেছি মানে কি। তারপরই মনে হল তিনি জানতে চান আমাকে থানায় আনা হয়েছে কেন।

না, আমি চুরি-ডাকাতি-পকেটমারি-ঘুস-চাদাবাজি কিছুই করিনি। তবুও আমাকে থানায় আনা হয়েছে। অপমানকর ভাষায় কথা বলা হয়েছে।

আমি বললাম, 'আমি কিছুই করিনি। রাস্তায় হাটাহাটি করছিলাম তখন ধরে এনেছে। যে ধরেছে তাকে জিজ্ঞেস করে দেখুন।'

'হাটাহাটি করতেছিলেন ক্যান ?'

বাবারে বাবা। আমার দেশ, আমার দেয়া ভ্যাট-ট্যাক্সের টাকায় তৈরী রাস্তা, সেখানে হাটাহাটি করার জন্য কৈফিয়ত দিতে হবে ? আমি যতদুর সম্ভব শান্তভাবে বললাম, 'হাটাহাটি করা আমার অভ্যেস।'

'আপনে কি মহাপুরুষ ?'

হঠাৎ করে মহাপুরুষের কথা কেন এল বুঝলাম না।

আমি মুখে হাসিভাব এনে বললাম, 'ডাক্তাররা বলে হাটাহাটি করলে স্বাস্থ্য ভাল থাকে। কোন রোগবালাই হয় না, ডায়াবেটিস হয় না, হার্টের অসুখ হয় না। এসব হলে তো চিকিৎসা করাতে পারব না, তাই আগে থেকেই বিনা পয়সার চিকিৎসা করাই। সকাল, বিকাল, দুপুর যখন সময় পাই তখনই হাটি। রিক্সাভাড়ার খরচটাও বাঁচে। ওরা আজকাল দশটাকা-বিশটাকার নিচে নড়ে না। দশটাকার জন্য খাটার চেয়ে আরাম করে বসে সিগারেট টানা ভাল কাজ মনে করে।'

নাইজেরিয়ান জেনারেল অপলক তাকিয়ে থাকল আমার দিকে। তারপর হিসহিস করে বলল, 'এইডা কোন যায়গা জানেন ?'

আমি বললাম, 'আগে লোকে লালদালান বলত। এটার রঙ হলুদ। মনেহয় লালরঙের দালান ভাড়া পাওয়া যায়নি।'

এবারে গলার স্বর আরো তীক্ষ্ণ হল, 'এইডা চেনেন ?'

তার টেবিলের ওপর একটা ফুটদেড়েক লম্বা লাঠি। আমি একপলক দেখে নিয়ে বললাম, 'এটা মনেহয় গজারির ডাল।'

জেনারেল কি বলবে ভেবে পাচ্ছে না। আমি আরেকটু বাড়লাম, 'শুনেছি লম্বা লাঠি চায়না থেকে আমদানি করা হয়। এগুলো এদেশেই হয়। ভাওয়ালের বণে অনেক গাছ আছে।'

হাত বাড়িয়ে লাঠিটা ধরল জেনারেল, 'এইডা দিয়া কি হয় ?'

বুঝলাম আর কথা বাড়াতে চায় না। আমার মন ক্রমাগত বলছে মকবুলের ভুত রয়েছে কোথাও। সে কিছু একটা করবে। রক্ষা করবে আমাকে।

আমি বললাম, 'দেখুন, আমি খুব সাধারন মানুষ নই। আমি ভবিষ্যত বলতে পারি ?'

জেনারেল বলল, 'আপনে কি মহাপুরুষ ?'

আবারও মহাপুরুষ। আমার মাথায় এল না বিষয়টা। ভবিষ্যত বলা কি মহাপুরুষের কাজ!

আমি বললাম, 'আমার মন বলছে আপনার খারাপ কিছু হতে যাচ্ছে। চেয়ার ছেড়ে উঠবেন না।'

জেনারেল লাঠিটা হাতে নিয়ে দুহাত টেবিলে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়াল। মুখে বলল, 'আইচ্ছা।'

পা বাড়িয়ে টেবিল ঘুরে আসতে শুরু করল আমার দিকে। আমি শ্বাস বন্ধ করে অপেক্ষা করতে থাকলাম।

এরপর কি হল আমার পক্ষে বর্ননা করা কঠিন। তিন পা হেঁটে চতুর্থবার পা ফেলতে দেখলাম তাকে। তারপরই সে অদৃশ্য হয়ে গেল টেবিলের আড়ালে। ধপ করে একটা শব্দ। মুহূর্তের জন্য শুন্যে তার বুট দেখলাম। তারপর খটাস।

শব্দ শুনে বাইরে থেকে দৌড়ে এল দুজন। আমিও না দাঁড়িয়ে পারলাম না। দেখলাম দুজন দুদিক থেকে দুহাত ধরে টেনে উঠানোর চেষ্টা করছে জেনারেলকে।

সে কোনমতে মেঝের ওপর বসল। সোজা তাকিয়ে আছে আমার দিকে। তারপর ঝটকা মেরে নিজের দুহাত ছাড়িয়ে নিল। বামদিকে তাকিয়ে ধমকে উঠল, 'আউট।'

সাথেসাথে ভেতরে ঢোকা দুজন বেরিয়ে গেল। দেখলাম দরজার সামনে আরো কয়েকজন জড়ো হয়েছিল। মুহূর্তে তারাও উধাও হয়ে গেল।

টেবিল ধরে উঠে দাঁড়াল জেনারেল। তারপর টেবিল ধরে ধরে নিজের চেয়ারে এসে বসল ধপ করে। সেখানে হেলান দিয়ে বসে সোজা তাকাল আমার দিকে। আমিও বসলাম।

কয়েক মুহূর্ত কেটে গেল। হঠাৎ করেই যেন চারিদিক নিস-ব্ধ হয়ে গেছে। আমি নিরবতা ভেঙে গলায় সহানুভুতি এনে বলতে চেষ্টা করলাম, 'আমি আগেই বলেছিলাম-'

সে হাত তুলে থামিয়ে দিল আমাকে। তারপর একটা আঙুল খুলে দরজার দিকে তাক করল, 'যান।'

আমি তারদিকে তাকিয়ে দেখলাম। আর হঠাৎ করেই যেন মকবুলকে দেখতে পেলাম। আমার মনে হল অসহায় একজন মানুষ বসে রয়েছে আমার সামনে। সে জানেনা তার কি করা উচিত। কেউ যেন কলের পুতুলের মত তাকে দিয়ে সব কাজ করাচ্ছে। এই পরিসি'তির বাইরে নিয়ে গেলে ছোটবেলায় দেখা মকবুলের মত একজনকে দেখতে পাব।

আমি কোনমতে বললাম, 'আমার পকেটে যে টাকা ছিল সেগুলো বের করে নিয়েছে।'

তার ডান হাত থাবা মারল একটা বেলের ওপর। দেখতে দেখতে দরজায় একজনের ছায়া দেখা গেল।

'মোসলেম।'

মুর্তিটা চলে গেল। একটু পরই আরেকজন এসে ঢুকল। তাকে দেখেই চিনলাম। এর কারনেই আমাকে থানায় আসতে হয়েছে। হাত দিয়ে ইঙ্গিত করায় টেবিলের পাশে এসে দাঁড়াল।

জেনারেল বলল, 'পকেটে কি আছে বাইর কর।'

সে হতবাক হয়ে একবার তারদিকে একবার আমার দিকে তাকাতে শুরু করল। বুঝে উঠতে পারছে না কি হচ্ছে এখানে।

'কি কইছি ?'

এবারে তার হাত চলে গেল পকেটে। একগোছা টাকা বের করে টেবিলে রাখল। জেনারেল তাকাল আমার দিকে।

আমি হাত না বাড়িয়েই বুঝতে পারছি আমার চকচকে পঞ্চাশ টাকার নোটটা সেখানে নেই। আমি বললাম, 'একটা চকচকে পঞ্চাশ টাকার নোট ছিল।'

জেনারেল বলল, 'সব পকেট খালি কর।'

কিছুক্ষন ইতস-ত করল মোসলেম। জেনারেলের দিকে তাকিয়ে কিছু বলতে সাহস পেল না। আসে- আসে- পকেট খালি করতে শুরু করল। পকেটের অভাব নেই। সামনে, পিছনে, পাশে, হাঁটুর নিচে। অনেকে বলে রকেট রাখার পকেট। সবগুলো একে একে খালি হতে থাকল আর বিভিন্ন আকারের টাকা জমা হতে থাকল টেবিলে। আমার চকচকে টাকাটার দেখা মিলল অবশেষে। আমি সেটা হাতে নিলাম।

জেনারেল বলল, 'ভাঁজ কর।'

মোসলেম হয়ত বুঝেছে এখানে কথা না বলাই উত্তম। সে মুখ ব্যাজার করে টাকা ভাঁজ করতে শুরু করল। আসলে ভুল বলা হল, সে টাকার ভাঁজ খুলতে শুরু করল। টাকাগুলোর ভাঁজ খুলে সোজা করে টেবিলে রাখতে শুরু করল। বড় টাকা নিচে, ছোট টাকা ওপরে।

সবগুলো টাকা রাখার পর জেনালের আমার দিকে ঘুরল, 'লন।'

আমি বললাম, 'এইটা আমার।'

জেনারেল টাকার দিকে তাকিয়ে এমনভাবে ঘাড়ে মটকা মেরে ইঙ্গিত করল যে আমি আরকিছু বলে ভরসা পেলাম না। মাঝখানে একটা ভাজ দিয়ে টাকাগুলো পকেটে ঢুকালাম।

জেনারেল বলল, 'যান।'

মোসলেম হতভম্ভ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মনে হচ্ছে কেঁদে ফেলবে। আমার ধারনা হল এই টাকার মালিক সে একা না। তার সঙ্গিরাও এর অংশিদার। আমার রীতিমত মায়া হল ওর জন্য। এই রোগা দুবলা স্বাস্থ্য নিয়ে সারাদিন পায়ে হেঁটে এদের ডিউটি করতে হয়। দিনে ষোল ঘন্টা - আঠার ঘন্টা।

জেনারেলের দিকে আরেকবার তাকিয়ে দেখলাম। মুখটা এখন হাসিহাসি। যেন খুব মজার কোন কাজ করেছে।

আমি কোনমতে 'খোদা হাফেজ' বলে বাইরে রওনা হলাম।

অফিসে ফিরে দেখলাম যজ্ঞ শেষ হয়েছে। অফিসের চেহারা পাল্টে গেছে। যে রুমে আগে বসতাম তার দরজায় বড় পর্দা ঝুলছে। আমি সেদিকে পা না বাড়িয়ে আকবরের রুমের দিকে এগোলাম। দেখলাম আকবর কথা রেখেছে। টেবিলে আমার জিনিষপত্র সাজানো। তার ওপর একটা চারকোনা কাগজের প্যাকেট, পাশে কোকাকোলার বোতল।

বিন্দুমাত্র দেরি না করে চেয়ারে বসে পরলাম। প্যাকেট থেকে সুবাস বেরচ্ছে। তাড়াতাড়ি সেটা খুলে তার আহ্বানে সাড়া দিলাম। আকবরের বিশাল চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে খেতে খেতে সামনের দিকে তাকালাম।

আমার টেবিল ভর্তি কাগজ। ছোটছোট কাগজ অনেকগুলো একসাথে করা। কোনটাতে দুশো, কোনটাতে তিনশ, কোনটাতে চারশ। আমার কাজ এই ছোট কাগজগুলো থেকে টুকলি

করে আরেকটা কাগজে উঠানো। ছাত্রকালে টুকলি করার অভ্যাস আমার একেবারেই ছিল না। অন্য যাদের দেখেছি তারাই বরং এই পরীক্ষায় ফেল করেছে, আমি সফলভাবে টিকে রয়েছি।

বিষয়টা আরেকটু ভেঙে বলা প্রয়োজন।

এই তথ্যগুলো কে দেখে জানিনা, তবে কেউ না কেউ দেখে। সেজন্যই হিসেবে গড়মিল রাখা চলে না। যদি গড়মিল হয়ও, টাকার অংক বেশি হতে হয়। তাতে কোম্পানীর লাভ। কম হলে কোম্পানীর ক্ষতি। আমার আগে কয়েকজনকে বিদায় নিতে হয়েছে এই কারনে। সেজন্যই আমি খুব সাবধানে কাজ করি। ভূল যাকিছু হয় তা বেশির দিকেই যায়, ভুলেও কখনো কম হয় না। আমিও এতটাই দক্ষতা অর্জন করেছি যে না দেখেই লিখে যেতে পারি। আমার কাজের ভাল দিক এটাই যে আমি টাকা পাই কাজ মেপে। যতগুলো হিসেব টুকলি করেছি তত টাকা।

সাথেসাথেই মনে পরল আমার একটা বিল জমা পরে রয়েছে। আমার মাসখানেকের খরচ। কোকাকোলার বোতলটা হাতে নিয়ে হেলান দিয়ে বসে বসিরকে হাক দিয়ে ডাকলাম।

'রুহুল সাব কাঁহাসে ?'

বসির থতমত খেল আমার ভাষা শুনে। আমার মুখে এই ভাষা শোনার অভিজ্ঞতা তার নেই। সে বলল, 'আপনের জন্য অপেক্ষা করতেছিলেন। তারপর বাইরে গেছেন। কাল সকালেই আপনারে দেখা করতে কইছেন।'

তারমানে আমার বিল টাকা হয়ে গেছে। আর এখানে অপেক্ষা করার কোন মানে হয় না। টুকলি করার কাজ দুচারদিন বাদ দিলেও সমস্যা হবে না। আমি অর্ধেক খালি বোতল আর খালি প্যাকেট বসিরকে নিয়ে যেতে বলে রুমটা আরেকবার ভাল করে দেখে নিয়ে বাইরে বেরিয়ে পরলাম।

বিকেল হতে এখনো ঢের বাকি। এখন রুমে যাওয়ার কোন অর্থ হয় না। হাফিজকে পাওয়ার সময় এখনো হয়নি। রাস্তায় মহাপুরুষের মত হাটতে হাটতে ভাবতে শুরু করলাম কোথায় যাওয়া যায়। তণই মনে হয় ডাক্তারখানা কাছেই।

আমার এক বন্ধু বসেন ওখানে। ছোটবেলার বন্ধু। আমরা ডাকি আফজাল বলে, সে নিজে বলে আবজল। আমার মাঝে মাঝে তার সাথে সাক্ষাতের কারন ডাক্তার দেখানো না। রীতিমত বন্ধুত্বের খাতিরেই। ওসব ছোটখাট রোগবালাই আমার ধাতে টেকে না। আরেকটা কারন অবশ্য রয়েছে, ওর টেবিল পরিস্কার করা। ওষুধ কোম্পানীর লোকেরা বিনে পয়সায় ওষুধ আর কলম, প্যাড, ডায়রী, নোটবুক এইসব দিয়ে যায়। আমি সেই জঞ্জাল কিছুটা কমাই।

ওর ওখানে ভীড়ভাট্টা তেমন থাকে না। কারন রোগীর চেয়ে ডাক্তার সবসময়ই বেশি অসুস্থ থাকে। আমাকেই বিভিন্ন রকম পরামর্শ দিতে হয়। এবারও তার ব্যতিক্রম হল না। দেখলাম ফুলস্পিডে ফ্যান চালিয়ে নিজের মস- চেয়ারে হেলান দিয়ে কাতরমুখে বসে রয়েছে। আমাকে দেখে হাসল।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'খবর কি ? শরীর ঠিক আছে ?'

আফজাল হাসার চেষ্টা করল, 'এই একটু।'

জিজ্ঞেস করলাম, 'কি হয়েছিল ?'

আফজাল বলল, 'বাইরে যা গরম। রাস্তা থেকে একটা ডাব কিনে খেয়েছিলাম। তখন থেকে পেটটা।'

আমি বললাম, 'খুব খারাপ কাজ করেছ। আর কক্ষনো এমন ভূল করবে না। ওয়াসার পানি ছাড়া আরকিছু মুখে দেবে না। কবার হয়েছে ?'

আফজাল সেকথার উত্তর না দিয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠে পিছনের ছোট দরজার ওপাশে চলে গেল। আমি টেবিলের জিনিষপত্র গুছাতে শুরু করলাম। অনেকবার ভেবেছি কাঁধে ঝুলানো একটা ব্যাগ ব্যবহার করলে মন্দ হয়না। আজকালকার ছেলেমেয়েরা যেমন ব্যবহার করে। আগেকার দিনের পন্ডিতের টিকির মত পান্ডিত্য বহন করে। যার ব্যাগ যত লম্বা সে তত বড় পন্ডিত। আমি মাটি ছুইছুই পর্যন্ত দেখেছি। প্রতিপদে পা দিয়ে ধাক্কা মারতে হচ্ছে।

আফজাল ফেরত এসে নিজের চেয়ারে হেলান দিয়ে বসল। আমি বললাম, 'কদিন হাওয়া আর পানি ছাড়া কিছু খাবে না।'

সে সায় দিল মাথা নেড়ে। আমি একটা ট্যাবলেটের পাতা সামনে তুলে ধরে জিজ্ঞেস করলাম, 'এটা ওষুধ না আটা ?'

সে বলল, 'সেভেন্টি পারসেন্ট কমিশন।'

আমি সেটাকে কাগজ ফেলার ঝুড়ির দিকে ছুড়ে দিয়ে চামড়া বাধানো নোটবুক হাতে নিয়ে উঠে দাড়ালাম, 'যাই এখন। খাওয়ার নিয়ম যা বললাম মেনে চলবে। রোগ ওষুধে সারে না, পথ্যে সারে। আর অত রোগী দেখে কাজ নেই। যার সতিসত্যি চিকিৎসা দরকার সে এখানে আসে না। তোমার এখানে আসেই পেটব্যথা আর জ্বরের রোগী। সামনের ছেলেটাকে বলে রাখ। এন্টাসিড, এসপিরিন ও-ই দিতে পারবে।'

বলে বাইরে বেরিয়ে পরলাম।

এদিক ওদিক আরো কিছুটা সময় কাটিয়ে, দুবার চা খেয়ে যখন সন্ধ্যে হয় হয় তখন রওনা দিলাম হাফিজ স্বরেআ মন্ডলের কথা। হাফিজ স্বরেআ মন্ডল তার পুরো নাম। আমি অবশ্য তাকে স্বরেআ বলে ডাকি না, সরাসরি হাফিজ বলেই ডাকি। তারসাথে আমার যথেষ্ট মিলও রয়েছে। আকবরের কথামত সেও কারো এক ডজনে নেই। কর্তা ইচ্ছা কর্ম, এই হাফিজের ধর্ম। আমি সেদিকেই রওনা হলাম।

তার দরজার কলিংবেল টিপে মিউজিক শোনা গেল না। পরিবর্তে খুটুস করে যে শব্দ হল তারই উত্তরে হাফিজের গলায় সুর শোনা গেল, 'মইরা গেলে বাত্তি নাইগো কবরে।'

হাফিজের না দেখেই অনুমান করার অদ্ভুত শক্তি রয়েছে। আমি নিশ্চিত সে বুঝেছে সুইচ টিপেছে কে। আরো কিছু ক্ষমতা রয়েছে হাফিজের, কিন' সেকথা এখন না।

আমি গলা চড়িয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'কবরে বাস করছেন নাকি ?'

হাফিজ গায়ে গেঞ্জি চড়াতে চড়াতে দরজা খুলল, 'কি করমু কন। কারেন্ট একঘন্টা থাকে দুইঘন্টা থাকে না। এইডারে কব্বর ছাড়া কি কইতে পারি।'

আমি বিষয়টাকে সহজভাবে দেখাতে চেষ্টা করলাম, ‘এতে কর্মদক্ষতা বাড়ে। দুঘন্টার কাজ একঘন্টায় করবেন, এরপর তিনঘন্টার কাজ একঘন্টায় করবেন। সেইসাথে ঘন্টার হিসেব রাখবেন। ঘড়ির প্রয়োজনই হবে না, কারেন্ট এল কি গেল দেখে সময় জানবেন। এসব না করার জন্যই বাঙালীর উন্নতি হয়না। দেখেননা অন্যদেশে বাঙালি কত দক্ষতার সাথে কাজ করে। এখন দেশেই সুযোগ পেয়েছেন একটু কাজে লাগান। দেশের জন্য কিছু করুন।’

হাফিজ মুখ হা হয়ে গেল আমার বাক্য শুনে। সে বলল, ‘বাস-রে। মুডে আছেন মনেহয়।’

সত্যিই আমি মুডে আছি। বললাম, ‘অন্ধকার কবরে বসে কি করবেন। চলুন বেরই। পকেট ভর্তি টাকা।’

এখানে হাফিজের সম্পর্কে আরেকটা কথা বলে নেই। কার টাকায় খাবে, কার টাকায় খাবে না সে সিদ্ধান্ত হাফিজের নিজের। আমি দেখেছি কারো কারো হাতে সে পানিও খায় না। কেউ যদি টাকার উল্লেখ করে তাহলে নিশ্চিতভাবেই সে তাকে পিঠ দেখাবে। আমি ব্যতিক্রম। মাঝেমাঝে নিজের খাবার না জুটলে আমি ওর স্মরনাপন্ন হই, হাফিজও তার প্রতিদান দেয়।

তাকে আরেকবার বলতে হলনা। মনে হল সে সুযোগ খুঁজছিল বাইরে বেরনোর। কিংবা কোথায় যাবে ঠিক করতে পারছিল না। বলার সাথেসাথে ফুটপাত থেকে ষাট টাকায় কেনা সার্টটা গায়ে চড়িয়ে স্যান্ডেলে পা গলিয়ে তালাচাবি হাতে নিয়ে তৈরী। সার্টের দাম আমি জানি কারন এটা কেনার সময় আমি সাথে ছিলাম। একজন এই সার্ট দেখিয়ে একদিন গর্ব করেছিল টনি ব্লেয়ার গায়ে দেয় বলে। আমার কথা হাফিজ ফেলতে পারেনি। তালাটা লাগিয়ে চাবি পকেটে রাখতে রাখতে জিজ্ঞেস করল, ‘কোনদিকে ?’

আমি বললাম, ‘ভাবা দরকার কি ? ভাবলে ব্রেনের ওপর অকারনে চাপ পড়ে। হাঁটতে শুরু করি, যেদিক যাওয়া যায়।’

এটা হাফিজেরই কথা। অনায়াসে তার ওপর চালিয়ে দিলাম।

হাফিজ আর আমি এইসময় একসাথে হলে যা ঘটে তার বর্ননা দেয়া কঠিন। আসলে বলা ভাল, তার বর্ননা থেকে হয়ত দুজনের মানষিক সুস্থতা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে। চারিদিকের অফিস ফেরতা মানুষ, বিচিত্র পোষাক পড়নে রঙ মেখে মার্কেটের দিকে ছোটা মানুষ, পথের দুপাশে ভিড় করে রাখা গাড়ি আর তাদের মধ্যে দিয়ে ধাক্কাধাক্কি করে চলা গাড়ি-রিক্সা-ট্যাক্সি-বাস হৈচৈ সবকিছু আমাদের এদিক ওদিক দিয়ে পাশ কাটিয়ে চলে যায়। আর আমরা দুজন নিজেদের মধ্যে রাজ্যের জ্ঞানগর্ভ বিষয় নিয়ে আলাপ করতে করতে হাঁটতে থাকি। বিজ্ঞান-দর্শন-ইতিহাস-রাজনীতি-শিল্প-সাহিত্য কিছুই বাদ থাকে না। হাফিজ বলে যায় আমি তাতে উৎসাহ দেই। কখনো কখনো উস্কে দেয়ার জন্য বিপরীত কথা বলি। দুইতেই সমান কাজ হয়।

আমি কথায় কথায় বললাম, ‘আমরা কাজ বাদ দিয়ে তত্ত্ব নিয়ে বেশি মাধা ঘামাই। সেজন্যই এই জাতির কিছু হয়না। প্রত্যেকে নিজের নিজের কাজ ঠিকমত করলে কোন সমস্যাই থাকত না।’

হাফিজ বলল, 'আপনেও অন্যদের দলে যোগ দিলেন। আমি আঠারো বছর ধইরা খুঁজতাছি কোন কামডা আমার জন্য ঠিক। অহনও পাই নাই। শেখার মধ্যে শিখছি খিসি-। এই ভাষায় কথা না কইলে রিক্সাঅলা, দোকানদার মনে করে পাইছি এক মক্কেল। দেহায়া দেই ঢাকা কত দুর। আপনে আমারে কন-'

একটা রিক্সার ধাক্কা খেয়ে লাফ দিয়ে রাস্তার পাশে সরতে হল তাকে। আজকাল এনিয়ে কেউ প্রতিবাদ করে না। রিক্সাচালকও উত্তর দিতে জানে। ধমকে বলে, 'বেল বাজাইছি না!'

হাফিজ শুধু একবার তারদিকে তাকিয়ে দেখল। রিক্সাচালক সম্ভবত ধাক্কার বিষয় কিছুই টের পায়নি। অথবা এদিকে দৃষ্টি দিয়ে নষ্ট করার মত সময় হাতে নেই। সে দিব্বি চলেছে তার পথে। মাঝখানে আমাদের আলাপের বিষয়টা হারিয়ে গেল। একপাশে দাঁড়িয়ে হাফিজ চারিদিকে দেখল। কিছুটা দুরে ছোট রাস্তার মধ্যে একটা দোকান দেখা যাচ্ছে। সম্ভবত কানাগলি। গাড়ি চলাচল চোখে পড়ছে না।

হাফিজ সেদিকটা দেখিয়ে বলল, 'চলেনতো। বিবিসির খবরডা শুনি।'

আমার সম্মতির অপেক্ষা না করেই সে দোকানের দিকে রওনা হল। তারসাথে পা না বাড়িয়ে উপায় থাকল না। রাস্তার পাশের চায়ের দোকান। মনেহয় দোকানদার ভাগ্যবান। বেশ একটু যায়গা পেয়েছে। কয়েকটা ছোটছোট বেঞ্চ বসানো রয়েছে। লোকজন বসে রয়েছে ভিড় করে। চা খাচ্ছে, সিগারেট খাচ্ছে, বিস্কুট-কলা-পাউরুটি খাচ্ছে। অনেকগুলো রিক্সা থেমে রয়েছে। একজন রিক্সাচালক যাত্রীর সিটে বসে তার নিজের সিটে দুপা তুলে হেলান দিয়ে চোখ বন্ধ করে সিগারেট টানছে। চারিদিকে ফুরফুরে হাওয়া। একেবারে স্বর্গীয় দৃশ্য।

দোকানের দিকে তাকিয়ে কি খাওয়া যায় ভাবতে থাকলাম। কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে হাফিজ চা দিতে বলল। আমাকেও বাধ্য হয়ে সামনে হাত বাড়িয়ে একটা কলা ছিড়ে মুখে দিতে হল। এই কলার বর্ননা দেয়া আমার সাধ্যের বাইরে। চকচকে হলুদ রঙ। কোনার দিকে সবুজ থেকে গেছে। আমার ধারনা খোসার যে নিজস্ব স্বাদ-গন্ধ রয়েছে ভেতরের অংশে সেটাও নেই। সমাজে বাস করতে হলে খোসা খাওয়া যায় না বলেই সেটা থেকে বিরত থাকতে হল। হাফিজের দিকে ইঙ্গিত করায় মাথা নেড়ে নিষেধ করল। তার কান খাড়া।

মাত্র বাংলা অনুষ্ঠান শুরু হয়েছে। আমি কলা খেতে খেতে শ্রোতাদের একবার দেখলাম। মাঝবয়সি থেকে শুরু করে বয়স্ক, বৃদ্ধ সবধরনের শ্রোতাই রয়েছে। বিবিসিতে কি বলল আমার কানে পৌছাল না, তার প্রতিক্রিয়া শুনতে পেলাম। একজন বলল, 'কথাডা শুনলেন। কতবড় চাপা।'

আরেকজন গলা খুলে বলল, 'বিবিসির কামই তো তাই। বিবিসি নামের মানে কি জানেন ? বড় বড় চাপা। এমুন যার নাম সে চাপাবাজি ছাড়া আর কি করব ?'

তার পাশের জন খিক খিক করে হাসল কিছুক্ষন। তারপর সে গলা চড়াল, 'আপনে বাংলা ইংরাজি গড়মিল কইরা ফালাইছেন। কেউ কি নিজের এমুন নাম দেয়। বিবিসি মানে হইল বুশ-ব্লেয়ার কোম্পানী। অহন মালিকানা পাল্টাইছে কিনা জানি না। মনেহয় বুশ-ব্রাউন কোম্পানী হইছে। দুইজনের আধাআধি শেয়ার। বিবিসির অফিস কই জানেননি মিয়া ? বুশের বাড়ি।'

একজন ভদ্রলোককে দেখছিলাম ওদিকে চুপ করে বসেছিলেন। পড়নে সাদা পাঞ্জাবী। মনোযোগ দিয়ে অন্যদের কথা শুনছিলেন। এবার তিনি মুখ খুললেন, 'চুপ করেন। যা বোঝেন

না তাই নিয়া কথা কন। বিবিসি মানে হইল বাংলা বেতার কেন্দ্র। লন্ডনে যেসব বাঙালী থাকে তারা বানাইছে। ভলিউমডা বাড়ান তো একটু। দ্যাশের কথা শুনতে দ্যান।'

কেউ আর কথা বাড়াল না। রেডিওর ভলিউম বেড়ে গেল। আমি মনোযোগ দিয়ে দেশের কথা শুনতে থাকলাম। একজন কর্মকর্তার সাক্ষাৎকার নেয়া হচ্ছে।

'পর্যাপ্ত ত্রানের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। আমাদের হাতে পর্যাপ্ত পরিমান খাদ্যসামগ্রী, ওষুধপত্র সবকিছু রয়েছে। সেগুলি বিতরনের জন্য পর্যাপ্ত পরিমান লোককে নির্দেশ দেয়া হয়েছে।'

'ঘুর্নঝড়ের ক্ষয়ক্ষতির কি তথ্য আপনাদের কাছে আছে ?'

'পর্যাপ্ত ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। ঘরবাড়ি, ফসল, গাছপালা ইত্যাদির পর্যাপ্ত ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। আমরা মিটিং ডেকেছি, ক্ষয়ক্ষতির পরিমান জানার চেষ্টা করছি।'

'আহত-নিহতের সংখ্যা সম্পর্কে সর্বশেষ তথ্য কি ?'

'পর্যাপ্ত পরিমান লোক নিহত হয়েছে, পর্যাপ্ত পরিমান আহত। আরো নিখোঁজ রয়েছে। এই মুহুর্তে আমার হাতে সঠিক সংখ্যা নেই। তবে আমরা পর্যাপ্ত খোঁজখবর নিচ্ছি। পর্যান্ত পরিমান লোককে কাজ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। তারা পর্যাপ্ত যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছে।'

'ক্ষতিগ্রস্থ লোকেরা অভিযোগ করছে তারা ত্রান পাচ্ছে না। কেউ কেউ একাধিকবার পাচ্ছে, কেউ একেবারেই পাচ্ছে না। ত্রানের দাবীতে মিছিল সমাবেশ পর্যন্ত হয়েছে।'

'এটা সত্য নয়। আমি দশ মিনিট আগে জেলা প্রশাসকের সাথে কথা বলেছি। তিনি জানিয়েছেন এধরনের কোন ঘটনা ঘটেনি। বিচ্ছিন্নভাবে দুএকজন ত্রান কম পাওয়ার কথা বললেও বলে থাকতে পারে। খবর পাওয়ার সাথেসাথে আমরা যথাযথ ব্যবস্থা নিচ্ছি।'

'আমরা জেলা প্রশাসকের সাথেও কথা বলেছি, শ্লোগানের শব্দও আমাদের কাছে রয়েছে।'

'এটা গ্রহনযোগ্য নয়। আমি জেলা প্রশাসককে ক্যাটাগরিক্যালি জিজ্ঞেস করেছি। তিনি এধরনের কোন ঘটনার কথা বলেননি।'

হাফিজ নিচুস্বরে জিজ্ঞেস করল, 'এইডা কার গলা কইতে পারেন ?

আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'কোনটা ?'

হাফিজ বলল, 'ওইযে, বিবিসির। আমি সকলের গলা চিনি। কামাল, শাকিল, শুভ, কাদির, মাসুদ-সব। খালি একজনের নাম পুলক না পুলব বুঝি না। মনেহয় দুইডাই।'

কারো নাম দুটা হোক আর দুডজনই হোক তাতে আমার কোন আপত্তি নেই। আমি তাড়াতাড়ি বললাম, 'আমি রেডিও শুনি না। আমার রেডিও নেই।'

হাফিজ বলল, 'অ। আইচ্ছা একটা কিনা দিমুনে। ফুটপাতে পঞ্চাশ টাকায় পাওয়া যায়। এফএম শুনতে পারবেন। আমি তো খবরের কাগজ, টেলিভিশন সবকিছুর কাম চালাই ওই দিয়া। অহন সারাদিন সারারাত গানবাজনা কেচ্ছা কাহিনী শুনা যায়।'

আমি রেডিও শুনি না বহুকাল। ছোটবেলায় অনুরোধের আসর শুনতাম এটুকুই শুধু মনে আছে। একসময় ক্রিকেট খেলা, ফুটবল খেলাও শুনতাম। এখন কি শোনা যায় জানি না। ফুটবল খেলা হয় না। ক্রিকেট খেলা মাঝেমাঝে রাস্তায় দাঁড়িয়ে শোনা যায়। রাজনীতি-অর্থনীতি বিষয়ে আমার কোন আগ্রহ নেই। হাফিজ একবার বলেছিল রাজনীতি-অর্থনীতি আর ধর্ম এই তিনে যে যত মুর্খ তার গলাবাজি তত বেশি। নিজেকে মুর্খ বানানোর কোন পরিকল্পনা আমার নেই।

যতটা সম্ভব গলাবাজি এড়িয়ে চলতে চেষ্টা করি। একমাত্র হাফিজের সাথেই যাএকটু আলাপ করি।

হাফিজ তখনো বলে যাচ্ছে, 'দ্যাখছেন, একজন মানুষ রেডিতে চাকরি করতাছে। কহনো কেউ দেহে নাই অথচ গলা শুনলেই লক্ষ লক্ষ মানুষ চিনতে পারব। এইডার ব্যাখ্যা কি কইতে পারেন ?'

আমি একটু হাওয়া দিতে চেষ্টা করলাম, 'আপনার নাম হল একজন বিখ্যাত ব্যক্তির নামে। বিখ্যাত ব্যক্তির নামে যাদের নাম তার খ্যাতিমান হয়। একদিন আপনাকেও লক্ষ লক্ষ মানুষ নাম শুনেই চিনবে।'

হাফিজ তার স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতে হেসে বলল, 'তাইলে শোনেন একখান। সত্যি ঘটনা। ধান্দাপানির জন্য কম কাম তো করি নাই। একবার গেছি জড়িপ করতে। একজনরে জিগাইছি আপনে নিরক্ষর না স্বাক্ষর। সে কয় স্বাক্ষর। জিগাইলাম কতদুর পড়াশোনা করছেন, কয় পড়াশোনা করি নাই। জিগাইলাম লিখতে পড়তে পারেন। সে কয়, না। কইলাম তাইলে স্বাক্ষর হইলেন ক্যামনে ? সে কয় বাবামায়ে শখ কইরা নাম রাখছে। অহন কন তো কোন বিখ্যাত ব্যাক্তির নাম মনে করলেন। এই নামে তো বিখ্যাত কুখ্যাত চোর ছ্যাচোর ধান্দাবাজ সবই রইছে।'

মনেমনে প্রমাদ গুনলাম। এই একটা বিষয়ে আমি হাফিজকে বড়ই ভয় পাই। তারসাথে তর্কে যেতে আমার কোন আগ্রহ নেই। তাড়াতাড়ি কোনমতে বললাম, 'কেন, ওই যে বিখ্যাত কবি। পারস্যের।'

হাফিজ বলল, 'অ।'

ততক্ষনে আমাদের চা খাওয়া শেষ। হাফিজের সিগারেট খাওয়া শেষ। বিবিসির বাংলা অনুষ্ঠানও শেষ। আমরা সামনের দিকে পা বাড়ালাম।

এখানে রাস্তার একদিকে বাতি জ্বলছে। রাস্তায় গাড়ির ভিড় থাকলেও ফুটপাথ উচু বলে সেখানে উঠতে পারছে না। এ যায়গায় দোকান বসানোর সুযোগও নেই। এরই মধ্যে একযায়গায় দুজনকে কোনমতে পাশ কাটিয়ে যাচ্ছি, কানে এল, 'এই যে, শুনছেন।'

শুনেছি বলেই থামলাম। দেখলাম এক ভদ্রলোক। পড়নে ধবধবে সাদা পোষাক। লম্বাই-চওড়াই দুদিকেই আমার দেড়া। মুখ ভর্তি কালো কুচকুচে দাঁড়ি, মাথায় পাগড়ি। একমাত্র নুরানী চেহারা বলেই এর বর্ননা দেয়া সম্ভব।

কাছে ছোট একটা ব্যাগ। ব্যাগটা খোলা। একপলক দেখেই বুঝেছি ওতে রয়েছে ছোটবড় নানা সাইজের শিশিবোতল। হাতে ছোট একটা আতরের শিশি। আমার আগেই একজন যুবককে পাকড়েছেন। সে হাঁসফাঁস করে ছোটার চেষ্টা করছে। নিতান্ত ভদ্রতার খাতিরে যেতে পারছে না। আমাকে দেখে আরেকজন খদ্দেরের লোভ সামলাতে পারেননি।

আমি ভদ্রতা রক্ষার্থে এগিয়ে গেলাম।

তিনি বললেন, 'একটা কথা বলতাম, যদি কিছু মনে না করেন।'

আমি নির্বিকার মুখে বললাম, 'বলুন।'

তিনি একটুকরো তুলা আঙুলে ধরে সামনে বাড়িয়ে ধরলেন, 'এটা একটু দেখবেন। খুব ভাল আতর।'

আমার অনুমানে বিন্দুমাত্র ভুল হয়নি। সোজাসুজি বললাম, 'আমি আতর ব্যবহার করি না।'

তিনি বললেন, 'আজ থেকে করেন। আতর ব্যবহার করা রসুলে সুন্নত। আতরে মন পবিত্র হয়। রাসুলুল্লাহ-'

তার কথা শেষ হল না। হাফিজ কাছে এসে দাঁড়িয়েছে লক্ষ করিনি। বাধাটা এল তার কাছ থেকে, 'আতর বেচবেন ?'

ভদ্রলোক বিরক্ত হয়ে তাকালেন তার দিকে। বোধহয় দৃষ্টি দিয়ে প্রশ্ন করলেন, আপনাকে তো ডাকিনি। এরমধ্যে নাক গলাচ্ছেন কেন ?

উত্তর না পেয়ে হাফিজ সোজা কথায় গেল, 'ব্যবসা করার ইচ্ছা থাকে দোকান দিয়া বসেন। আর ধর্মপ্রচার করার ইচ্ছা হয় মসজিদে যান।'

তিনি বোধহয় এতটা আশা করেননি। আশেপাশে সমর্থনের আশায় তাকালেন। ধর্মবিরুদ্ধ কথার প্রতিবাদ করার মানুষের অভাব হয় না। যার হাটার শক্তি নেই সেও লাঠি হাতে পথে নামে। তার দুর্ভাগ্য সেই মুহূর্তে সেখানে তেমন কেউ নেই। সবাই নিজের কাজে ব্যস-। সমর্থন পাওয়ার সম্ভাবনা না দেখে কোনমতে বলতে চেষ্টা করলেন, 'দেখুন, আমি-'

হাফিজ বলল, 'আপনে কি সেইডা দেখছি। অহন রাস্তা মাপেন।'

তিনি শেষ চেষ্টা করলেন, 'আপনি আমাকে-'

হাফিজ এবার গলা নিচু করল, কিন' যা বলল সেটা একেবারে চুড়ান্ড, 'আবার মুখ খুললে দাত ফালায়া দিমু, হারামজাদা। যা ভাগ।'

হাফিজের এই মুর্তি আমি আগেও দেখেছি। এসময় তারসাথে কথা বাড়ানো মানে নিজের বিপদ ডেকে আনা। এই ভদ্রলোক সেটা বুঝতে ভুল করলেন না। ব্যাগটা গুছিয়ে কাঁধে ঝুলিয়ে বিপরীত দিকে হেঁটে গেলেন। এতক্ষন চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকা যুবককে দেখে মনে হল সে যেন হাফ ছেড়ে বাঁচল।

আমরা আবার হাঁটা শুরু করলাম। আমার খারাপ লাগছিল হাফিজের ব্যবহারে। ভদ্রলোককে অন্যভাবে বললেও চলত। কথাটা হাফিজকে না জানিয়ে পারলাম না। কোনমতে রাস্তার ধাক্কাগুতো এড়িয়ে বললাম, 'ভালভাবে বললে হত না। কথা শোনানোই যেখানে কথা।'

হাফিজ তাতে বিন্দুমাত্র গুরুত্ব না দিয়ে তাচ্ছিল্যভরে বলল, 'এতদিনেও যখন শেখে নাই তখন আর শিখব না। ধাক্কাইয়া গুতাইয়া যতদুর চালান যায়।'

হাফিজ দিনদিন অধৈর্য্য হয়ে উঠছে। আগে দেখতাম কেউ তর্ক করলে সে বিরক্ত হত না। যতরকমভাবে সম্ভব যুক্তি দিয়ে বুঝাতে চেষ্টা করত। এখন একেবারেই সেটা করে না। দুকথা বলেই যেন বুঝে যায় ফলটা কি হবে। শেষ পর্যন্ত যদি গালাগালি কিংবা হাতাহাতিতে যেতেই হয় তাহলে অন্য কথায় সময় নষ্ট করে লাভ কি ?

সারা বিশ্বজুড়ে মানুষ গবেষনা করছে মানুষ কেন চরমপন'ী হয়, কেন আক্রমনের পথ বেছে নেয়। সারা বিশ্বে এভাবেই শতশত, নাকি হাজার হাজার, নাকি লক্ষ লক্ষ চরমপনী' তৈরী হচ্ছে। আমার সামনে হাফিজ যেন একটা উদাহরন। আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি ক্রমেই সে আক্রমনাত্মক হয়ে উঠছে। যুক্তিতে যদি কাজ না হয়, ভালকথায় যদি ফল না ফলে তাহলে শক্তি পরীক্ষা। সেখানেই হারজিত। চরমপন'োই যদি একমাত্র পন'ো হয় তাহলে দেরী করে

লাভ কি ? বিশেষজ্ঞরা বলেন চরমপন'োর নাকি তিনটা স-র। হাফিজ বোধহয় দ্বিতীয় স-রে অবস্থান করছে।

আমার মনটা খারাপ হয়ে গেল এসব ভাবতে ভাবতে। নিজে ধর্ম কতটুকু পালন করি বা না করি, নামাজ পড়ি বা না পড়ি, সবসময় ধর্মকে অন্যদৃষ্টিতে দেখে এসেছি। কেউ ধর্মের কথা বললে চুপ করে শুনি, সায় দেই। কথার প্রতিবাদ করাকে ধর্মের বিরুদ্ধাচরন বলেই জানি। হাফিজ মনেহয় সেসবের ধার ধারে না।

আমি সুযোগ পেয়ে সেকথা বলার চেষ্টা করলাম, 'লোকটা মনেহয় মন খারাপ করেছে।'

'কোন লোক ?' জিজ্ঞেস করল হাফিজ।

বেশ তো! দিব্বি ভুলে গেছে।

আমি মনে করিয়ে দিলাম, 'ওই যে আতর বিক্রি করছিল।'

হাফিজ বলল, 'ওইডারে মন থিকা বিদায় করেন। জীবনে বহুত ভন্ড দেখছি। ধর্মের বুলি ঝাড়লে ধর্মের উন্নতি হয় না। যাকিছু ক্ষতি করার তা এরাই করে।'

আমি আমার যুক্তি ধরে রাখতে চেষ্টা করে বললাম, 'কিন' লোকটাকে দেখে ভালমানুষ বলেই তো মনে হল।'

'আপনের দৃষ্টিতে।' বলল হাফিজ, 'পৃথিবীর সবচাইতে ধার্মিক কে কইতে পারেন ?'

আমার মাথায় ঢুকল না প্রশ্নটা। তার ওপরই বিষয়টা ছেড়ে দিয়ে বললাম, 'আপনিই বলুন।'

হাফিজ বলল, 'ভিক্ষুক। তারা আল্লা-রসুল, কোরান-হাদিস ছাড়া কথাই কয় না। যারা ভিক্ষা দেয় তারা মনে করে ধর্মের কাম করলাম। আপনে তারে দান করবেন, সে আল্লার কাছে হাত তুলব আর তারই দোয়ার গুনে আল্লা আপনারে দান করব। নয়ত তারা হইল ব্যাংক। অহন ব্যাংকে জমা রাখবেন পরকালে উঠাইবেন। আমি এইসব বিশ্বাস করি না। আমি ভিক্ষুকের চেয়ে চোর বেশি পছন্দ করি। তার কামে ভন্ডামি নাই। সে জানে খারাপ কাম, তারপরও করে কারন অন্য কাজ কেউ দেয় নাই। ভিক্ষুকরে অন্য কাম দিলেও সে করব না।'

আমি বিষয়টা হাল্কা করার চেষ্টা করলাম, 'আপনি হঠাৎ ভিক্ষুকের ওপর এত চটলেন কেন ?'

হাফিজ বলল, 'ভিক্ষুকের ওপর চটি নাই। চটছি সেইসব মানুষের ওপর যারা ভিক্ষুক বানায়া রাখছে। ভিক্ষা দেয়া ধর্মের কাম মনে করে। আপনারে একটা অভিজ্ঞতার কথা কই। একবার এক অফিসে এক কামে গেছি। ওই আতরঅলার মত একজন লোক ঘুস চাইছে। জোহরের নামাজে ঢুকব, ওযু কইরা আইছে, তখনও হাত ভেজা, কয়- ট্যাকা দেন নামাজের দেরী হইতাছে। কোনমতে ট্যাকা নিয়া পকেটে ঢুকাইয়া মসজিদে দৌড় দিল। এইসব লোকরে ধার্মিক মনে করার কোন কারন নাই।'

আমি বললাম, 'কিন' নামাজ পড়ার প্রয়োজনও তো আছে। একদিকে পাপকাজ আরেকদিকে ধর্ম। দুইয়ে কাটাকাটি।'

হাফিজ বলল, 'আমাগো দ্যাশে সব মানুষ কোরান-হাদিস বিশেষজ্ঞ। কেমনে হইছে আমার জানা নাই। যেইখানে যেই হাদিস লাগে সেইডা লাগাইয়া দেয়। আমি আপনারে একটা হাদিস শোনাই। আমার তৈরী হাদিস না, গাজ্জালীর বইতে পাইবেন। সহজ কথায়, আপনে যদি একশ

টাকার একটা পোষাক কেনেন, তার নব্বুই টাকা যদি হালাল আয় হয় আর দশ টাকা হারাম আয় হয় তাইলে যতদিন সেই পোষাক ব্যবহার করবেন ততদিন আপনের নামাজ হইব না। এইসব লোক এসব জানেনা এইকথা মনে কইরেন না। ইসকুলে সবাইরে পড়াইছে নামাজের শর্ত কি কি। মানুষ সেইগুলানরে নিজের মতো পাল্টাইয়া লইছে।'

আমার মনে পরল এইধরনের কিছু, আহকাম-আরকাম না কি যেন পড়েছিলাম ইসলামিয়াতে। প্রায় কিছুই মনে নেই। এনিয়ে আর কথা বাড়াতে ইচ্ছে হল না। একটা বই হাতে পেলে আরেকবার দেখে নেব।

আমরা এখন বড় রাস্তার পাশে। কোনদিকে যাচ্ছি ঠিক নেই। হাফিজ ক্রমাগত হেঁটেই চলেছে। আমারও তাকে অনুসরন করে চলতে হচ্ছে।

রাস্তায় হাঁটা কষ্টসাধ্য। কে কোনদিক থেকে ধাক্কা মারবে ঠিক নেই। এত ধাক্কা এড়িয়ে তার ফাঁকে কথা চালানো যায় না। আমি সুযোগ খুঁজছি হাফিজের কাছাকাছি গিয়ে নতুন কথা পারব।

বেশ কিছুটা এগিয়ে গেছি। হাফিজ সামনে, আমি পিছনে। হঠাৎ করেই আমার কি মনে হল, ঘাড় ঘুড়িয়ে পিছনদিকে তাকালাম। তারপর কোন শক্তি কাজ করল জানি না, একটানে হাফিজকে নিয়ে রাস্তার পাশে হুমড়ি খেয়ে পড়লাম। আর আমরা যে যায়গা দিয়ে হাটছিলাম ফুটপাতের সেই অংশে অর্ধেকটা উঠিয়ে দিয়ে একটা গাড়ি এগিয়ে গেল সামনে। রাস্তায় প্রচন্ড ভিড়। ভিড় এড়াতে সে শর্টকাট বেছে নিয়েছে।

হাফিজ কোনমতে মুখ তুলে বলল, 'নম্বরটা দেখছেন ?'

আমি তাড়াতাড়ি দেখে নিলাম। এটা নিয়ম। নিয়ম ভেঙে গাড়ি চালানো অপরাধ। কেউ নিয়ম ভেঙে গাড়ি চালালে অভিযোগ করতে হয়। নম্বর ছাড়া অভিযোগে কাজ হবে না। আমি গাড়ি দেখে কোম্পানী, মডেল এসব বুঝি না। তবে লাল রঙের গাড়ি, নম্বরটা মনে রাখা সহজ।

হাফিজ উঠে ময়লা ঝাড়তে ঝাড়তে বলল, 'শয়তানের নম্বর।'

হাফিজের গলা শুনে মনেহল আতরঅলার বিষয়টা ভুলে গেছে। আমি খুশিই হলাম তাতে। মুখে অবাক ভাব এনে বললাম, 'শয়তানের নম্বর কি জিনিষ। নম্বর তো নম্বর, সংখ্যা। এগার পচিশ পয়ত্রিশ। তারসাথে শয়তানের কি সম্পর্ক ?'

হাফিজ তার স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতে বলল, 'আপনে সংখ্যাদর্শন পড়েন নাই, বুঝতে সময় লাগব। সংখ্যা ভাল, সংখ্যা মন্দ। সংখ্যা চোর, সংখ্যা সাধু। সংখ্যা স্বর্গ সংখ্যা নরক। চারিদিকে যা দ্যাখতাছেন সবই সংখ্যা।'

হাফিজের কথাবার্তা একেবারে শান্ত।

সংখ্যাদর্শন কেন, কোন দর্শন নিয়েই আমার মাথাব্যথা নেই। সংখ্যা দিয়েই একজন লটারির টাকা পায় একজন পায়না সেটা জানি, তারপরও সংখ্যার গুনে কেউ ভাল হয় কেউ খারাপ হয় এটা আমি মনে করি না।

আমি বললাম, 'ওসব দর্শন টর্শন থাক। অন্তত পুলিশকে নাম্বারটা জানিয়ে রাখি। বেপরোয়া গাড়ি চালাচ্ছে, কখন কাকে মেরে বসে।'

হাফিজ এমনভাবে আমার দিকে তাকাল যে আমি হোঁচট খেলাম। থেমে চারিদিকে একবার দৃষ্টি বুলিয়ে দেখলাম। একজন মোটর সাইকেলে বসে, দুজন না- তিনজন দাঁড়িয়ে। সমস-ঘটনাই তারা দেখেছে। সাদা রঙের বিশাল মোটরসাইকেলটা দেয়া হয়েছে সম্ভবত এদেরকে

তাড়া করতেই। শুনেছি কেউ যেন গতিতে একে হারাতে না পারে সেজন্য এরচেয়ে শক্তিশালি মোটরসাইকেল অন্যদের কিনতে দেয় না।

যাকগে। যার যা খুশি করুক, যেভাবে খুশি চলুক। আমার কি। এসব চিন্তা করার জন্য কেউ আমাকে টাকা দেয় না। আমার বিরক্তি লাগছে হাফিজের ওপরই। কতক্ষন থেকে শুধু হেঁটেই চলেছি। কোথায় যাচ্ছি জানি না। হাজার বছর ধরে পথ হাঁটার আনন্দ জীবনানন্দের থাকলেও থাকতে পারে, আমার নেই।

আমি হাঁটা থামিয়ে বললাম, 'তাহলে ? এখন ?'

হাফিজ বলল, 'একটা প্রশ্ন মনে আসছে, আগে উত্তরটা দিয়া লন। পৃথিবীর সব দেশে, সব সমাজে, সবকালে, সব পেশায় নামিদামী মহিলাদের নাম পাওয়া যায়। দর্শনের মইদ্যে মহিলার নাম নাই ক্যান ?'

আমি হা করে বললাম, 'সত্যি নেই ?'

হাফিজ বলল, 'আমার জানামতে নাই। দার্শনিকের নামের একটা তালিকা করলে দ্যাখবেন কোন মহিলা নাই। গ্রীক দর্শন, ভারতীয় দর্শন, চিনা দর্শন, পশ্চিমা দর্শন থিক্যা শুরু কইরা আজ পর্যন্ত। অবশ্য একেবারেই নাই কইতে পারি না। আমি আর জানিই বা কতটুকু।'

বুঝলাম পাশ কাটাতে চাইছে। আমি এত বোকা না যে খোঁচা মেরে চলে যাবে আর টের পাব না। মনোভাব যতটা গোপন করা যায় সেই চেষ্টা করে ভালমানুষ সেজে জিজ্ঞেস করলাম, 'সংখ্যা থেকে দর্শন, দার্শনিক থেকে মহিলা, এসবের হেতু কি ?'

হাফিজ বলল, 'মহিলাদের অনেক ভাল গুন আছে। তাদের মন খুব কোমল।'

আমি গলায় বিরক্তি এনে বললাম, 'তারমানে ? এসব আমাকে শোনাচ্ছেন কেন ?'

হাফিজ তাড়াতাড়ি সামাল দিল, 'আরে না-না, আপনারে মহিলার সাথে তুলনা করতাছি না। অনেক পুরুষ মানুষেরও মন নরম। পরের ভাল চায়, সবকথা বিশ্বাস করে, আইন মানে। এইজন্য আপনেরে আমি খুব পছন্দ করি। একেবারে সরলসোজা। তয় বাস-ববুদ্ধি একটু কম। এইদিকে মহিলার সাথে মিল আছে। আপনে রাগ কইরেন না। ভালর কোন জাত নাই। যেহানে ভাল দ্যাখবেন, শিখবেন। কোন লজ্জা নাই।'

বুঝলাম পুলিশ-টুলিশের ঝামেলায় সে যেতে চায়না। আমার নিজেরই একপর্ব হয়ে গেছে সেকথা তাকে জানাইনি। এদিকে এই আলাপ আর এই হাঁটার যেন অন্ত নেই। আকবরের কাচ্চি হজম হয়ে গেছে বহু আগে। চায়ের দোকানের কলাটাও। একসময় বললাম, 'চলুন এবার কিছু খাওয়া যাক। পেটে কিছু না দিলে আর চলছে না। পকেটে আছে যথেষ্ট, দুশ্চিন্তার কারন নেই।'

হাফিজ উদাসভাবে বলল, 'মাসের অহনো তিনদিন বাকি, ট্যাকা পাইলেন কই ? এডভান্স নিছেন ?'

হাফিজ টাকার উৎস জিজ্ঞেস করবে একথা একবারও মনে আসেনি। এবার সত্যিই বিপাকে পড়লাম। সত্যিকথা বললে এই টাকার খাবার তো খাবেই না বরং এগুলো যে কোথায় গিয়ে পড়বে সেটা অনুমান করাও দুঃসাধ্য। বেশ মনে আছে সেই ঘটনার কথা। একবার দুজনেই পকেট খালি, পেট খালি অবস্থায় ঘুরছিলাম। হঠাৎ হাফিজ একযায়গায় থেমে চারিদিকে তাকাতে শুরু করল। দুরে এক পিচ্চি কাগজ টোকাচ্ছিল, পিঠে মস-বড় চটের বস্তা। তাকে ডেকে আনল। তারপর পায়ের কাছে দেখিয়ে দিল। দেখলাম একশ টাকার নোট পড়ে রয়েছে।

মাঝখানে ভাঁজ করা। একটা হতে পারে, বেশিও হতে পারে। পিচ্চিটা সেটা তুলে নিয়ে দাঁত দেখিয়ে যাওয়ার পর বললাম, 'টাকাটা নিলে হত না। পরে নাহয় ডাবল টাকা ভিক্ষে দিতাম।' হাফিজ বলেছিল, 'এইডা হইল ইমানের পরীক্ষা। বিনা পরীক্ষায় ফেল করতে নাই।'

এই হাফিজকে টাকার উৎস জানানো অসম্ভব। আমি এখনও ইমানের পরীক্ষায় এতটা সফল হইনি। মুখে হাসি এনে বললাম, 'আমার তো কাজেরও ঠিক নেই, টাকারও ঠিক নেই। সকালে রাজা বিকেলে ভিক্ষুক। এই আরকি। মাসের হিসেব দিয়ে কি হবে।'

হাফিজের চোখ থেকে সন্দেহ দুর হল না। সে বলল, 'চলেন আপনারে খুব ভাল খানা খাওয়ামু। কি খাইবেন কন?'

আমি পাল্টা প্রশ্ন করলাম, 'আপনিই বলুন কি খাওয়া যায়। আজ তো ঈদের দিন না যে ঈদের খাবার পাবেন।'

হাফিজ একেবারে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বলল, 'ক্যান, সমস্যা কোথায়। চলেন আপনারে ঈদের খাওন খাওয়াই। আরে চলেন না।'

ঈদের খাবার কোথায় পাওয়া যায় জানার আগ্রহ সামলাতে পারলাম না। তার পিছু নিলাম। কিছুক্ষন হাঁটার পরই দেখলাম সে বাড়ির দিকে যাত্রা শুরু করেছে।

জিজ্ঞেস করলাম, 'বাড়ি যাচ্ছেন নাকি ?'

হাফিজ বলল, 'হ। আপনারে ঈদের খাওন খাওয়ামু। একেবারে নিজের হাতে রান্না করা সেমাই।'

রাতে বাড়ি ফিরে দেখলাম রাফি বসে রয়েছে। যতদুর জানি রাফি নামটা রফিকের নিজস্ব সংস্করন। আধুনিকীকরন বললে ভাল মানায়। রাফির বহুরুপী চেহারা দেখে আমি অভ্যস্থ। আজ দেখলাম লম্বা চুলগুলো টান করে পিছনে বেঁধেছে। কানে তিনভাঁজ করা দুল। রাফির চেহারাটা এমনই যে খুব ভালভাবে না দেখলে ছেলে না মেয়ে বোঝা কঠিন। দুলটা নতুন আমদানি। মনেহয় বাগিয়েছে কারও কাছ থেকে। পোষাক বরাবরের মত। জিন্সের প্যান্টটা আর ইঞ্চিখানেক নামলে খসে পড়বে। কখনো খসে পড়েছে কিনা জানিনা। একবার জিজ্ঞেস করায় বলেছিল এতে সুবিধা আছে। অনেক সুন্দর সুন্দর মেয়ে এসব পছন্দ করে।

বন্ধ ঘরের সামনে বসে আমার জন্য অপেক্ষা করার কারনটাও আমার ভালমতই জানা। হাত খালি। কিছু দিতে হবে। কোথাও বন্ধুত্ব সংকটে পরেছে, না দিলে বন্ধুত্বহানির সম্ভাবনা। আমি কথা না বাড়িয়ে থানা থেকে পাওয়া পুরোটাই তার হাতে দিয়ে দিলাম। সেও দেরি না করে খুশিমনে চলে গেল।

মনেহল হঠাৎ করেই যেন কাঁধ থেকে একটা বিশাল বোঝা নেমে গেল।

হাফিজের ওখানে যথেষ্ট খেয়েছি। রাতের খাবার চিন্তা না করলেও চলবে। বিছানায় শোবার সাথেসাথে ঘুম এসে আকড়ে ধরল।

হঠাৎ করেই বৃষ্টি নেমেছে। ঝড়ো দমকা হাওয়া কিছুক্ষন দাপাদাপি করে চলে গেছে। এখন পানি ঝরছে ঝিরঝির করে। কিছুক্ষন আগে যে প্রচন্ড গরম ছিল তা নিমেশে নিঃশেষ হয়ে গেছে। রাস্তার প্রচন্ড ভিড় উধাও। লোকজন রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে। কেউ কেউ বৃষ্টির মধ্যেই রাস্তায় নেমে হাঁটাপথে রওনা দিয়েছে।

আমি রাস্তায় নামলাম। ধুলিঝড়ে সারা শরীর ময়লায় মাখামাখি হয়ে গেছে। নিজের হাতের দিকে তাকালাম। হঠাৎ করেই আমার হাত যেন বেলুনের মত ফুলে গেছে। পুরো শরীরটাই ভারী হয়ে গেছে। কোনমতে পা ফেলে রাস্তার মাঝখানে এসে দাঁড়ালাম।

আহ। কি শানি-। ঠান্ডা হাওয়ায় শরীর জুড়িয়ে যাচ্ছে। বরফের মত শীতল ফোটা পরছে সারা শরীরে। মাথায়। চোখ বন্ধ করে দাঁড়ালাম রাস্তার মাঝখানে। এ যেন পানশিরের আবহাওয়া। একেকটা ফোটা জীবনে নতুন প্রান সঞ্চার করছে। ক্রমেই সজিব হয়ে উঠছে সবকিছু।

একদিকে চেচামেচি শুনে চোখ খুলে তাকালাম। রাস্তার একপাশে একটা রিক্সা থেমে অপেক্ষা করছিল বৃষ্টি কমার। তার পিছনে একটা গাড়ি। এখন গাড়িটা যেতে চাইছে। রিক্সা না সরায় তাকে ধাক্কা মেরেছে। একদিকে চাকা বাঁকা হয়ে বসে গেছে। রিক্সায় বসে একজন মোটা মহিলা। কোলে ছোট্ট একটা শিশু। শিশুটি চিৎকার করছে। মহিলা তাকে সামলে নামার চেষ্টা করছে। রিক্সাচালক তার রিক্সার ক্ষতি দেখে এগিয়ে গেছে গাড়ির দিকে।

আমি কয়েক পা এগিয়ে গেলাম। মহিলা তখনো নামতে পারেননি। গাড়িটা আবার এসে ধাক্কা মারল। টলতে টলতে কয়েকহাত এগিয়ে গেল রিক্সা। মহিলা একহাতে রিক্সা ধরে আরেকহাতে বাচ্চা সামলাচ্ছেন। রিক্সাচালক দৌড়ে গেল রিক্সা বাঁচাতে।

আমি মুখ না খুলে পারলাম না। হাত নেড়ে চিৎকার করে বললাম, 'দেখতে পাচ্ছেন না ছোট বাচ্চা রয়েছে। ওদিক দিয়ে যান।'

গাড়ির চালক চেয়ে রয়েছে আমার দিকে। দাঁতে দাঁত চেপে কি যেন বলল। আমি এখান থেকে শুনতে পেলাম না। গাড়িটা পিছিয়ে গেল কিছুদুর।

আমি ঘুরে তাকালাম রিক্সার দিকে। মহিলা কোনমতে নেমে দাঁড়িয়েছেন। বৃষ্টির মধ্যে হাত দিয়ে বাচ্চার মাথা ঢাকার চেষ্টা করছেন। আমার দিকে তাকালেন। তারপরই তার মুখ খুলল। চিৎকার করে কি বলছেন। তারপরই হাত তুললেন। আঙুল দেখাচ্ছেন আমার পিছন দিকে। আমি সেদিকে ঘুরে দেখলাম গাড়িটা এগিয়ে আসছে। প্রতি মুহুর্তে গতি বাড়ছে। লাল রঙের গাড়িতে সোনালী নাম্বার প্লেট। এগার পচিশ পয়ত্রিশ। নাম্বার প্লেটটা সোজা এগিয়ে আসছে আমার পায়ের দিকে।

শরীরটা কেঁপে উঠেই থেমে গেল। চমকে উঠে চোখ খুললাম। না। আমি গাড়িচাপা পড়িনি। আমার ঘরে, আমার বিছানায় শুয়ে রয়েছি। জানালা খোলা। ঠান্ডা হাওয়া ঢুকছে সেদিক দিয়ে। হয়ত ধুলিঝড় হয়ে গেছে এখানে। সারা বিছানা কিচকিচ করছে বালিতে।

স্বপ্ন দেখছিলাম এতক্ষন।

আসে- আসে- উঠে বসলাম বিছানায়। প্রথমেই মনে হল মকবুলের কথা। কিভাবে তার পা খোয়া গেছে আমি দেখেছি। কোন গাড়ি তাও জানি। শয়তানের নম্বর। গাড়ির চালককে আমি ভিড়ের মধ্যেও চিনতে ভূল করব না। ওই মুখের ধরন, ওই চাহনি আমি ভুলব না কখনো।

আমার গলা শুকিয়ে গেছে। বিছানার পাশে বোতলে পানি রেখে ঘুমাই সবসময়, দেখলাম তাতে সামান্য পানি রয়েছে। সেটুকুই গলায় ঢেলে দিলাম। জানান দিয়ে পেট পর্যন্ত পৌছাল সেটা। আবার শুয়ে পরলাম।

আমি অপেক্ষা করলাম মকবুলের। ওর কোন সারাশব্দ নেই। একবার ডাকলাম মকবুল বলে, তাতেও সারা পেলাম না। ও বলেছিল কদিন থাকবে আমার সাথে। ও কি কথা রাখেনি ? নাকি ইচ্ছে করে চুপ করে রয়েছে। দেখছে আমি কি করি।

একসময় শুয়ে থাকা অসহ্য মনে হল। বিছানার বালির কণাগুলি পিপড়ের মত কামগাচ্ছে। উঠে বিছানার চাদরটা তুলে ঝাড়া দিলাম। ধুলাবালি ঝেড়ে আবার পেতে শুয়ে পড়লাম।

কি হচ্ছে এসব? আমি কেন এই স্বপ্ন দেখলাম। স্বপ্নে যা দেখেছি সেটা কি সত্যি ? যে গাড়িটা আমাকে চাপা দিতে যাচ্ছিল সেটাই কি মকবুলকে ধাক্কা দিয়েছে ?

আমি খোয়াবনামায় বিশ্বাস করি না। বিভিন্ন যায়গায় যে দুচার কথা পড়েছি তাতে দেখেছি মানুষ যা চিন্তা করে সেটাই স্বপ্নে দেখে। ফ্রয়েড রীতিমত গবেষনা করে গেছেন সেটা নিয়ে। বিজ্ঞানীরা নাকি আজকাল মানুষের চিন্তা রেকর্ড করতে পারে। স্বপ্ন রেকর্ড করলে দেখা যাবে সেটা অন্য সময়ে ঘটে যাওয়া কোন ঘটনার চিন্তা। কল্পনার রঙ চড়িয়ে সেটা অন্যরকম হয়ে গেছে। মন খারাপ থাকলে, শরীর খারাপ থাকলে মানুষ দুঃস্বপ্ন দেখে। মন ভাল থাকলে সুখস্বপ্ন দেখে। কারা যেন গবেষনা করে বের করেছে ফুলের সুবাস থাকলে সুখস্বপ্ন দেখা যায়। আমার এই দুঃস্বপ্ন নিশ্চয়ই আমার দুঃশ্চিন্তার ফল।

তাই হবে। রাস্তার বিষয়টা আমি ভুলতে পারিনি। গাড়ির নম্বরটা মনে রয়েছে। তারসাথে মকবুলের একসিডেন্ট তালগোল পাকিয়ে গেছে।

সবকিছু ভুলে ঘুমানোর চেষ্টা করলাম।

সকালে অফিসে পৌছে প্রথমেই টাকার খোঁজ নিলাম। পেয়েও গেলাম সাথেসাথেই। টাকা পকেটে রেখে বশিরকে চা দিতে বলে ঘরে এসে আকবরের প্রাক্তন চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে চোখ বুজলাম। রাতে একেবারেই ঘুম হয়নি। শেষরাতে কিছুটা ঘুমিয়েছিলাম তারপরও

মনেহচ্ছে ঘাটতি থেকে গেছে। চা খেয়ে একটু ঘুমিয়ে নেব কিনা ভাবছি। এই ঘরে দরজা টেনে দিয়ে অনায়াসে ঘুমিয়ে নেয়া যায়।

শব্দ শুনে চোখ খুলে দেখি বসিরের সাথে উকি মারছে আনিস। আনিসের চোখ হতভম্ভ। বশির চা নামিয়ে রাখায় তাকে আরেক কাপ আনতে বললাম। কাপটা ঠেলে দিলাম আনিসের দিকে।

আনিসের সাথে আমার পরিচয় অনেক বছরের। ঠিক কোথায় মনে নেই। একবারে মনে নেই বললেও ভূল হবে। সম্ভবত বেশ কয়েকবার দুজন দুজনকে দেখেছিলাম, কেউ আগ বাড়িয়ে কথা বলিনি। তারপর একদিন ও হেসে এগিয়ে এসে আমাকে চা খাওয়াতে চাইল। সেই থেকে শুরু। তারপর ঘনিষ্ঠতা।

আনিস সম্পর্কে একটা কথা না বললে চলে না। সে কবি। আমার ধারনা রীতিমত উচুদরের কবি। আধুনিক কবিদের মত ডিকশনারি দেখে কঠিন কঠিন শব্দ বাছাই করে কবিতা লেখে না। তার কবিতা একেবারে মন থেকে লেখা। কবিতার জন্য ও সবকিছু ত্যাগ করতে রাজি। অন্তত ছিল এক সময়। আমার ধারনা প্রয়োজনীয় সুপারিশ পায়নি বলেই কেউ ওকে কবি হিসেবে চেনার সুযোগ পায়নি। কেউ বই-পত্রিকায় ছাপেনি। বিরক্ত হয়ে একবার নিজের টাকায় বই ছেপেছিল। নিজের টাকা, আমার কাছে ধার করা টাকা। মাসখানেক ধরে কম্পোজের দোকানে, প্রেসে, বাঁধাইয়ের দোকানে দৌড়াদৌড়ি। বাসা বদলের সময় বইগুলো ফেরিঅলার কাছে বিক্রি করে পরিবহন খরচ কমিয়েছিল। আমি সেই বইকে ফুটপাথে বিক্রি হতে দেখেছি। দেখে খুশিই হয়েছি। যারা টাকার অভাবে লাইব্রেরিতে যায় না তারা অন্তত পড়-ক। একসময় ওর নাম ছড়াবে। কে নাকি চানাচুরের ঠোঙায় প্রচার পাওয়া লেখায় বিশ্বখ্যাত হয়েছিল।

কবি শিল্পীদের মন নরম হয়। এরই ফল হিসেবে আনিস বিয়ে করেছে। একেবারে হঠাৎ করে। একবার গ্রাম থেকে ফিরে সাথে করে বাড়ি নিয়ে গেল দুপুরে খাওয়াতে। মাথায় ঘোমটা দেয়া একজন এসে পায়ে হাত দিয়ে সালাম করায় চমকে উঠলাম। আনিস তখন অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে। শেষে সেই মেয়ের মুখেই শুনতে হল বিয়ের কথা। আনিসের কথায়, আকারে-ইঙ্গিতে যা বুঝলাম তা হল সে তার ভালবাসা ফেলতে পারেনি। সবকিছু শুনে আমার ধারনা হয়েছে সম্ভবত সেই মেয়ে আনিসের কবিতার একমাত্র সত্যিকারের ভক্ত। আনিসের বউয়ের সাথে সেই একবারই দেখা। তাও অনেকদিন হয়ে গেছে। আগে সুযোগ পেলেই বউয়ের কথা তুলত, এখন সেটা করে না। তবে আমার ধারনা ওরা দুজন সুখেই আছে। এমন মিল দেখা সৌভাগ্যের ব্যাপার। বউয়ের প্রসংগে কখনো প্রসংশা ছাড়া অন্যকথা শোনায়নি।

আনিসকে যখন থেকে চিনি তারথেকে এতটুকু পাল্টায়নি। স্বাস্থ্য, চেহারা, পোষাক একই থেকে গেছে। সাদামাটা একটা সার্ট, সাদামাটা প্যান্ট, পায়ে বেল্টঅলা স্যান্ডেল, কাঁধে একটা কবি ব্যাগ। কোন পরিবর্তন নেই। শুধু কপালের কাছে সামনের চুলগুলো একটু কমেছে এই যা। তা কপাল বড় হওয়া ভাল লক্ষন। সে সামনের চেয়ার টেনে নিয়ে এগিয়ে বসে বলল, 'ব্যাপার কিরে ভাই। একেবারে তুলকালাম অবস্থা।'

রুমের চারিদিকে চেয়ে দেখতে থাকল সে।

আনিস সদা হাসিখুসি। অন্যের কাছেও সেটাই আশা করে। আমি বাহাদুরির হাসি হাসতে হাসতে মনে করিয়ে দিলাম, 'চা ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে।'

আনিস বিরক্ত হয়ে বলল, 'রাখেন আপনের চা। চা-তো কতই খাইছি। আগে দেইখা লই।'

রীতিমত চেয়ার উল্টে ঘুরে বসল সে। বশির আসা পর্যন্ত চলল তার এই দেখাদেখি। বশির হয়ত খুব অবাক হয়নি, কারন আনিসের ভাবভঙ্গির সাথে সে পরিচিত। নিরবে চা রেখে চলে গেল।

আনিস বলল, 'এইবার কন। বিষয়টা কি। প্রমোশন ?'

আমি মুখে হাসি ধরে রেখে বললাম, 'প্রমোশন বলতে পারেন, ডিমোশনও বলতে পারেন। আসলে একটু যায়গা বদল আরকি। আকবরের যায়গায় আমি, আমার যায়গায় আকবর। অন্য সবকিছু আগে যা ছিল তাই।'

আনিস বলল, 'আইচ্ছা।'

শব্দ করে চা খাওয়া আনিসের অভ্যাস। কিছু বললে বলে, 'মাইন্ড কইরেন না। এমনে না খাইলে চায়ের মজা পাই না। মুখে দিয়া গিলা ফেললে কি চা খাওয়া হয়। ভাল জিনিষ আসে-আসে- খাইতে হয়।'

আমার মানিয়ে গেছে। বরং শব্দ না করলে অবাক হব। মারাত্মক কিছু ঘটার আতংকে থাকব। তারচেয়ে এই ভাল। সে কথা না বলে চা খেতে থাকল।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'দিনকাল কেমন চলছে ? একেবারে সকাল সকাল এদিকে চলে এলেন। আপনি তো অনেক কিছু করেন।'

আনিস কাপটা টেবিলে নামিয়ে রেখে বামহাতের উল্টোপিঠে ঠোট মুছে স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতে বলল, 'তাইলে শোনেন। এক লোকের চুল উঠতে উঠতে তিনডায় আইসা ঠেকল। সে চুলের নতুন ষ্টাইল করল দুইডা দুইদিকে একটা মাঝখানে। কয়দিন পর আরেকটা গেল। তখন দুইডা রাখল দুইদিকে। তারপর আরো একটা গেল। তখন বিরক্ত হইয়া কয় যেদিকে খুশি যাক চুল নিয়া আর মাথাই ঘামামু না।'

আমি হাসতে হাসতে জিজ্ঞেস করলাম, 'এই গল্প কেন ? আপনার কাজ কি একটাতে এসে থেমেছে নাকি ?'

আনিস বলল, 'একটায় আইছে, তয় থামছে কিনা কইতে পারি না।'

তার আসার হেতু বুঝতে সময় লাগল না। আনিসের একটা অদ্ভুত গুন রয়েছে। যখন হাতে টাকা থাকে ঠিক তখনই আসে। ভুলেও সংকটের সময় আসে না। মাত্র হাতে টাকা পেয়েছি আর সে এসে হাজির। প্রস্তাবটা তার তরফ থেকে আসাই ভাল। তার চাহিদার পরিমান জানা যাবে। আমি ধীরেসুসে' চা খেতে শুরু করলাম। ইচ্ছে করলে আধঘন্টা, কি এক ঘন্টাও কাটানো যায় এমনভাবে।

আনিস বলল, 'কি যে সমস্যায় পড়ছি রে ভাই। আমার একমাত্র বিলাসিতা হইল ঘরে একটা ফ্যান। সেকেন্ডহ্যান্ড কিনছিলাম। কয়েল পাল্টাইছি, ক্যাপাসিটার পাল্টাইছি। নতুনের চেয়ে বেশি খরচ পরছে। রাতের বেলা তিনডার সময় কারেন্ট অফ। একেবারে দুইঘন্টা।'

চারিদিকে আরেকবার দেখে নিল আনিস। তারপর গলা নিচু করল, 'আপনের এখানে ঘুমান যায় ? রাইতে ঘুমাইতে পারি নাই। মানে, আপনারে আর কি কমু কন, হাতপাখা নাড়তে নাড়তে-'

ভেঙে বলা প্রয়োজন হল না। আমি পাশের দিকে দৃষ্টি দিয়ে বললাম, ‘এখন ঘুমাতে চাইলে ঘুমাতে পারেন। আমি যতক্ষন থাকি ততক্ষন কোন সমস্যা নেই। কিন' তাতে কি রাতের সমস্যার সমাধান হবে ? রাতে তো এখানে থাকি না। তাছাড়া আপনার বউ আছে। হাতপাখা না নাড়লে সে গরমে কষ্ট পাবে। তার কি করবেন ?’

আনিস অবাক মুখভঙ্গি করে বলল, ‘হ। আপনে হইলেন বুদ্ধির ডিব্বা আর আমারে জিগান কি করমু। আপনেই কন কিংকর্তব্য।’

আমি আসে- আসে- বলতে চেষ্টা করলাম, ‘কারেন্ট সমস্যায় কেউ জেনারেটর কেনে, কেউ ব্যাটারী কেনে। দুইয়ের তো অনেক দাম।’

আনিস উত্তর না দিয়ে এমনভাবে মাথা নাড়তে থাকল যে বুঝলাম এগুলো তার ধাতে সইবে না। বললাম, ‘পুরনো দিনে ফেরা যায় কিনা দেখতে পারেন। সবইতো এখন উল্টোদিকে যাচ্ছে। আপনি বড় একটা টানা পাখা লাগিয়ে নিন। ছাদের কাছে ঝুলাবেন, সাথে লম্বা একটা দড়ি। দড়ি ধরে আসে- আসে- টানবেন। ইচ্ছে করলে পায়ের সাথে বেধেও নিতে পারেন। পাখার ধার দিয়ে ময়ুরের পালক লাগাবেন। দিব্বি ফুরফুরে হাওয়া ছাড়বে।’

আনিস বলল, ‘দড়ি ধরে মারো টান, রাজা হবে খান খান।’

আমি তার বক্তব্য না বুঝে প্রশ্ন করলাম, ‘তারমানে ?’

আনিস বলল, ‘মানে এই আরকি। কর্তা ইচ্ছা কর্ম। যাউক গা, মাইনষে মরুভূমিতেও থাকে, বরফের মইধ্যেও থাকে। আমরা তাগো চাইতে অনেক ভাল আছি। গরম ঠান্ডা দুইই মানাইয়া যায়। পায়ে জুতা না থাকলে যার পা নাই তার কথা মনে করবেন। নিজের অসুবিধার কারনে পরের দোষ ধরলে ফায়দা কি।’

আমি বললাম, ‘সেটা আপনি পারেন। আর সকলে পরের খুঁত ধরতেই ব্যস-। নিজের দিকে তাকায় কে ?’

আনিস বলল, ‘তাইলে শোনেন। এক যায়গায় তিনজন নামাজ পড়তেছিল। একজন পথিক আইসা জিগাইল অমুক যায়গা কোনদিকে। একজন সেইদিকে হাত দেখাইয়া কইল ওই দিকে। পাশের জন তারে ধমক দিয়া কয় নামাজের সময় কথা কইতে নাই জান না ? তৃতীয়জন তারে ধমক দিয়া কইল তুমি কথা কইলা ক্যান ?’

এটা আনিসের স্বভাব। যেকোন বক্তব্য সে গল্প দিয়ে প্রকাশ করতে পারে। তার গল্পের উৎস ভেবে আমি অনেক সময় অবাক হই। সারা পৃথিবীর গল্প যেন তার জানা।

জিজ্ঞেস করলাম, ‘বাসা থেকে আসছেন ?’

আনিস বলল, ‘আপনের কাছে আসার জন্যই রওনা দিছি। পথে পরিচিত একজনের সাথে দেখা। চা-নাস্তা খাওয়াইল। আমি জিজ্ঞাস করলাম হঠাৎ এত খাতির যত্নের মানে। সে কয় খারাপ দিন আইতাছে। আচ্ছা কনতো, খারাপ দিন আইলে মানুষ ভাল হয় না খারাপ হয়।’

আমার উপদেশবানী শোনানোর অভিলাষ নেই। সরলমনেই বললাম, ‘কাকে ভাল বলবেন কাকে মন্দ বলবেন সেটা আপনার ইচ্ছে। একজনকে একমাস আগেও সাইকেল চালাতে দেখতাম। নিজের হাতে হাওয়া দিত। এখন গাড়ি চালায়। তার উন্নতি হয়েছে না অবনতি হয়েছে সেটা বিচারের দায়িত্ব কে নেবে। আলেকজান্ডার ধনী না ডায়োজিনিস ধনী সেটা ভাষার মারপ্যাচ। এই ভাষার মারপ্যাচে কি যায়আসে ?

আনিস বলল, 'মারপ্যাচটাই তো আসল কথা। এই মারপ্যাচের কারনেই বিনা অপরাধে একজন জেলে যায় আর অপরাধ কইরা একজন পুরস্কার পায়। বিয়ার খাওয়া হারাম, খাইবেন না। এনার্জি ড্রিংক খান কারো আপিত্ত নাই।'

'আপিত্ত নাই!'

'না, আপিত্ত নাই।' আনিস উত্তেজিতভাবে বলল, 'ভাষার ভুল ধইরেন না। যারা ভাষা লইয়া এত ফালাফালি করে তারাও বাংলা কইতে পারে না। কবি-সাহিত্যিক কন আর নেতা-বুদ্ধিজীবী কন, সব সমান। টেলিভিশনে সাক্ষাৎকার দেখলে বুঝতেন ভাষা কত কষ্টের। মনেহয় বাংলা ভাষায় অর্ধেক শব্দ নাই। বাংলা কইতে না পাইরা ইংরাজিতে যায়, সেইখানে ঠক্কর খাইয়া বাংলায় ফেরত আসে। কোনমতে উ-আ কইয়া বক্তব্য শেষ করে।'

আমি বললাম, 'সে তারা জ্ঞানীগুনি মানুষ। তাদের ভাষায় কি যায় আসে। সত্যিকারের বিশেষজ্ঞরা কথাই বলে না। হুঁ বলে, নয়ত মাথা নাড়ে। উপরে নিচে নাড়লে বুঝবেন ঠিক আছে আর পাশাপাশি নাড়লে বুঝবেন ঠিক নেই। চুপ করে থাকলে বুঝবেন আপনি বোকার মত প্রশ্ন করেছেন। সাধারন মানুষের কি এসব মানায়? যাকিছু খারাপ তা না দেখে যাকিছু ভাল সেটা দেখার চেষ্টা করুন না কেন?'

আনিস বলল, 'তাইলে শোনেন। এক ঘটক ঘটকালি করতাছে। মাইয়ার বাপে তারে কয়, পোলার তো একপা ছোট। ঘটক উত্তরে কয়, কেডা কইছে? পোলার একপা বড় সেইডা কন না কেন?'

জিজ্ঞেস করলাম, 'তারপর ? বিয়ে হয়েছিল ?'

আনিস বলল, 'সেইডা তো গল্পের বক্তব্য না। তবে কথা হইল, হইতে দোষ কি ? ঘটকের কাম ঘটকে করব, মিয়াবিবির কাম মিয়াবিবি করব। উকিলের কাম উকিলে করব। সকলেরই নিজের কাম ঠিক রাখা দরকার। ঠিক আছে কিনা আপনেই যাচাই করেন। দ্যাশে যে লক্ষ লক্ষ মামলা রইছে তারমধ্যে বিবাহসংক্রান্ত বিষয় দুই নম্বরে।'

'আর এক নম্বরে ?'

'জায়গা জমি।'

আমার মোটামুটি ধারনা ছিল এটাই হবে। অবাক হলাম না। সায় দিয়ে বললাম, 'তা হতেও পারে। সমাজ একেক সময় একেক নিয়মে চলে। একসময় ভালকে অনুসরন করে ভালর দিকে যায়, একসময় খারাপকে অনুসরন করে খারাপের দিকে যায়। এখন আমরা নিচের দিকে যাচ্ছি। একজন খারাপ কাজ করে আরেকজন সেটা শিখে তারচেয়ে খারাপ কাজ করে। সবাই এই নিয়মে চলছে।'

আনিস বলল, 'তাইলে শোনেন। এক লোকের দুই বউ আছিল। সে বাড়ি ফিরলে দুই বউ দুই পা ধোয়াইয়া দিত। একদিন দেখা গেল ছোটবউয়ের পায়ে ময়লা রইছে। বড়বউ কয়, ওই পায়ে ময়লা আমি এই পায়ে কাদা লাগায়া দিমু। দিছে কাদা লাগায়া। ছোটবউ কয়, ওই পায়ে কাদা এই পায়ে গোবর লাগায়া দিমু। দিয়ে গোবর। বড় বউ কয় ওই পায়ে গোবর, এই পা ভাইঙ্গা দিমু। এইডা হইল কোন।'

আমি হাসি থামাতে পারলাম না। হাসতে হাসতে বললাম, 'আপনি এসব গল্প যোগাড় করেন কোথা থেকে।'

আনিস উত্তর দিল, 'হায়রে। যার চক্ষু নাই সে দ্যাখে, যার আছে সে দ্যাখে না।'

তার বক্তব্য ধরতে না পেরে আমি বিরক্তি দেখিয়ে বললাম, 'আপনিও দেখি হাফিজের মত আধ্যাত্মিক কথা শুরু করলেন। একথার মানে কি ভেঙে বলুন।'

আনিস সেকথার উত্তর না দিয়ে বলল, 'হাফিজ ভাই!' শুন্যে হাত তুলে ছালাম করল, 'গুনী মানুষ। তার তুলনা নাই। আপনার সাথে দেখা হয় ?'

আমি বললাম, 'হ্যাঁ। গতকাল বিকেলে দেখা হয়েছে। আমাকে ঈদের খানা খাইয়েছে। আজ বিকেলেও যেতে পারি।'

আনিস বলল, 'আমার সালাম দিয়েন। ইস-রে। কি অন্যায় কামডাই না করছি। কতদিন দেখা নাই। আর করমুই বা কি কন। আমি যাই একদিকে, বউ টানে আরেকদিকে। টিভির নাটক দেইখা আবার নতুন শখ জাগছে। আমারে কয় সাথে নিয়া পার্কে যাইব, বাদাম ফুচকা খাইব, গাছতলায় বইসা থাকব। আইচ্ছা, কনতো- এই বয়সে কি এইসব মানায়। এইগুলান হইল উঠতি বয়সি পোলামাইয়াগো কাম। টাকার চিন্তা করতে হয় না, যখন যা দরকার বাপমায়ে সাপ্লাই দেয়। আমার কি সেই অবস্থা কন তো দেখি! না কইতেও পারি না। মুখের দিকে চাইলে মায়া লাগে। সবকিছু ছাইড়া আইসা রইছে আমার কাছে, ক্যামনে না করি কন ? . . আইচ্ছা, হাফিজ ভাই বুঝব। তারে নিয়া চিন্তা নাই। আগের ঠিকানা রইছে তো ?'

তাকে জানালাম, 'হ্যাঁ, ঠিকানা আগেরটাই।'

আনিস বলল, 'যাইতে সমস্যা একটাই। এতদিন রিক্সা-গাড়ির ফাঁক ফোঁকর দিয়া হাইটা যাওয়া যাইত। এখন সেই ব্যবস্থাও নাই। ওরা মনে করে মানুষরে ধাক্কা দেওয়া ওদের অধিকার।'

আমার সেই মোটার কথা মনে পরল। আমি বললাম, 'আজকাল মানুষও কম যায় না। ফাঁকা রাস্তায়ও গুতো দেয়। গতকাল একজন গুতো মেরে প্রায় ডাষ্টবিনে ফেলে দিয়েছিল।'

আনিস বলল, 'তিন নম্বর গরু।'

আমি মুখভঙ্গিতে বিস্ময় আনলাম, 'তিন নম্বর গরু। সেটা আবার কি জিনিষ ?'

আনিস আরেকটা গল্প বলতে গিয়েও নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, 'আপনে তো আবার বেশি গল্প পছন্দ করেন না। সংক্ষেপে কই। তিন নম্বর গরু হইল যে কারন ছাড়া কাম করে। ফাঁকা যায়গা থাকতে অন্যরে গুতা দেয়, অণ্যের পথ বন্ধ কইরা খাড়াইয়া থাকে, ডানদিকে যাইতে বামদিকে চায়, ভিড় দেখলে গিয়া উকি মারে, মিউজিক ছাড়া ঠ্যাং নাচায়, অকারনে মোবাইল বাইর কইরা টিপতে থাকে-

আমি বাধা দিয়ে থামালাম, 'আচ্ছা আচ্ছা। এতকিছু মনে থাকবে না। আপনি বরং একটা লিষ্ট করে দেবেন একসময়। দেখে দেখে মুখস- করব।'

আনিস বলল, 'আইচ্ছা। এই কাগজটা দ্যান।'

বলে আমার সম্মতির অপেক্ষা না করেই আফজালের কাছ থেকে আনা প্যাডটা নিয়ে কাঁধে ঝুলানো চটের ব্যাগে ঢুকাল। নিজে থেকেই একটা কলম বেছে এগিয়ে দিলাম ওর দিকে। তারপর কাজের কথায় ফিরলাম, 'কত টাকা হলে চলবে ?'

আনিস আমাকে হতভম্ভ করে দিয়ে বলল, 'ভাবছেন টাকার জন্য আসছি ? না-না টাকা লাগব না। আমি আইছি আসলে-'

কাঁধের ব্যাগটা সামনের দিকে টেনে এনে সে হাত ঢুকাল। ব্যাগ হাতরে একটা খাকি রঙের লম্বা খাম বের করল। বেশ মোটা খাম। সেটা আমার দিকে বাড়িয়ে ধরল, 'আসলে এইডা মনে করাই তো ঠিক। সবসময় এইজন্যই আসি। এই-যে। আপনে কত সময় যে কত টাকা দিছেন। আমার সব মনেটনে নাই। এইডা রাখেন। একটা কাম করছিলাম বছর তিনেক আগে। সেই টাকার জন্য কত যে ধর্না দিছি। একবার কয় দুইদিন পর, আরেকবার কয় এক সপ্তা পর। তিন বছর পর সেই টাকা পাইছি। আমার টাকা আবার কখন কোনদিকে যায় ঠিক ঠিকানা নাই। এইডা রাখেন। আমার জন্য আপনেতো আছেন। আল্লা ভরসা। হাফিজ ভাইরে কইয়েন সময় পাইলে যামুনে।'

খামটা টেবিলে রেখে আমাকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে আনিস দ্রুত বেরিয়ে গেল।

খাম খুলে দেখি পাচশ টাকার নোটের দুখানা বান্ডিল।

আনিস যাওয়ার পর অনেকক্ষন আমি একইভাবে বসে থাকলাম। আমার মাথায় আসছে না কিছু। সবকিছু কেমন এলোমেলো মনে হচ্ছে। হঠাৎ করে এমন সব ঘটনা ঘটছে কেন ? এত দ্রুত ঘটছে কেন ? সবকিছু যেন ঝড়ের গতিতে ঘটে চলেছে। কোনকিছুর ওপর আমার কোন নিয়ন্ত্রন নেই। যেন এক সাজানো নাটকে আমি অভিনয় করছি।

বাইরে শব্দ শুনে আমার সম্বিত ফিরল। দ্রুত টাকার প্যাকেটটা ড্রয়ারে ঢুকিয়ে ফেললাম। দরজার সামনে একবার উকি দিয়ে আকবর চলে গেল। মুখ দেখে মনে হল ওর মনটা খুশি।

ঠিক করেছিলাম অফিস থেকে বের হয়ে হাফিজের ওখানে যাব। এখন সেটা পাল্টাতে হচ্ছে। টাকা অফিসে রাখা যাবে না, হাফিজের ওখানেও নেয়া যাবে না। প্রথমত টাকার কথা তুললেই শতরকম ব্যাখ্যা দিতে হবে। যদি তাতে সন'ষ্ট হয়ও, ওর হাতে থাকলে কোনদিকে খরচ করে বসবে ঠিক নেই। ওর দয়ার শরীর।

ঠিক করলাম টাকা নিয়ে সোজা বাসায় যাব। আড়াই হাজার টাকায় একটা জাহাজের টেবিল কিনেছিলাম। কেনার কারন মুলত তাতে কয়েকটা ড্রয়ার আছে বলেই। টালা দিয়ে বন্ধ করে রাখা যায়। তখন আমার অবস্থা এমনই, মনে হত একটুকরো ব্যক্তিগত কাগজ রাখার যায়গা সারা পৃথিবীতে নেই। টেবিলটা কিনে ড্রয়ারে তালা দিয়ে চাবি পকেটে রাখতাম। কদিন পরই দেখলাম সেখানে রাখার মত কিছু নেই। সবসময় সেটা ফাঁকাই থাকে। এতদিনে রাখার মত কিছু পেলাম।

আনিস টাকাগুলো আমাকে দেয়ার কারন আমার মাথায় ঢোকেনি। এরসাথে তুলনা করার মত টাকা আমি তাকে দেইনি। একটা কারনই হতে পারে, টাকাগুলো আমার কাছে নিরাপদে থাকবে। যখন প্রয়োজন তখন একটু একটু করে নেয়া যাবে। নিজের প্রয়োজনের টাকা নিশ্চয়ই হাতে রেখেছে। আজকাল চাল-ডাল কিনতেও মানুষ হিমশিম খাচ্ছে। সেইসাথে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে বাড়িভাড়া-গাড়িভাড়া, গ্যাস-পানি-ইলেকট্রিক বিল। কদিন পর হয়ত জিম্বাবের মত ব্যাগে করে টাকা বয়ে নিতে হবে বাজার করতে। এক ব্যাগ টাকায় এক ব্যাগ সওদা।

ঘরে ঢুকে প্যাকেটটা টেবিলের ওপর রেখে চাবি ড্রয়ারে ঢুকিয়ে ঘুরালাম। তালা খোলা। তখনই মনে পড়ল, তালা দেবই বা কেন ? ভেতরে কিছুই নেই।

ড্রয়ারটা টেনে অর্ধেক বাইরে এনে টাকার প্যাকেটটা ঢুকালাম। সেটা ভেতরের দিকে ঠেলে দিতে কি যেন ঠেকল হাতে। ঠান্ডা, ধাতব কিছু। হাত বাড়িয়ে সেটা টেনে সামনের দিকে আনলাম। আর সাথেসাথে আমার শ্বাস বন্ধ হয়ে এল।

একটা পিস-ল। সত্যিকারের একটা পিস-ল।

কালচে রঙের, সত্যিকারের একটা পিস-ল আমার ড্রয়ারে।

মাথা ঘুরিয়ে তাকালাম। দরজা খোলা। দ্রুত দরজা বন্ধ করে এলাম।

যদি জানাজানি হয় তাহলে ? নির্ঘাৎ জেল। কারো কাছে একটা গুলি পাওয়া গেলেও জেলে যেতে হয়। অজামিনযোগ্য অপরাধ। এদেশের আইন তাই বলে। আর এটা রীতিমত একটা পিস-ল।

আমার মাথা ঘুরতে শুরু করল। কিছুতেই ভেবে পেলাম না আমার ড্রয়ারে পিস-ল এল কিভাবে। আমার সাথে কারো এমন শত্রুতা নেই যে আমার ঘরে পিস-ল রেখে পুলিশে খবর দেবে। আর- আমি যতদুর জানি, এধরনের পিস-লের অনেক দাম।

কোনমতে মাথা ঠান্ডা করে বিছানায় বসলাম। এত কাছে পেয়ে পিস-ল দেখার লোভ সামলাতে পারলাম না। দরজা বন্ধ। জানালা দিয়ে বাইরে থেকে কেউ দেখতে পাবে না। আমি পিস-লটা হাতে নিলাম। যা ধারনা করেছিলাম তারচেয়ে অনেক ভারী। হয়তো গুলি ভরা আছে।

আমি দেখার চেষ্টা করলাম। এক যায়গায় চাপ দিতে ক্লিক করে শব্দ হল, আর হ্যান্ডেলের নিচের দিকে একটা অংশ বেরিয়ে পরল। সেটা টেনে বের করলাম। সিনেমায় এমনটাই দেখেছি। ট্রিগারে চাপ না দিলে ভয়ের কিছু নেই।

সত্যিসত্যি গুলি ভরা।

আবারও সেটাকে যায়গামত ঢুকালাম। আবারও ক্লিক শব্দ করে সেটা আটকে গেল।

নিজেই নিজেকে বুঝালাম। আমার মাথা ঠান্ডা রাখতে হবে। মাথা গরম করা মানে নিজের বিপদ ডেকে আনা। এটা এখান থেকে সরিয়ে ফেলতে হবে। আপাতত তালা দেয়া থাক।

বড় একটা খাম নিয়ে পিস-লটা তারমধ্যে ঢুকালাম। তারপর ড্রয়ারে আগের যায়গায় রাখলাম। টাকার খামটা রাখলাম তারপাশে। ড্রয়ারে তালা দিয়ে টেনে দেখলাম। বাইরে বেরিয়ে ঘরে তালা দিলাম। ঘরের তালা টানাটানি করার অভ্যেস আমার কখনোই নেই। আজ সেটাও করলাম। তারপর বাইরে বেরলাম।

আমি সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছি। আমাকে সাহায্য করতে পারে একমাত্র হাফিজ। জানি ছাত্র থাকাকালে সে রাজনীতি করত। কয়েকবার পিস-লের গল্পও করেছে। ওকে কোনভাবে বুঝিয়ে বলতে হবে এই বিপদ থেকে উদ্ধার করতে। যত তাড়াতাড়ি করা যায়।

আমি সোজা তার বাড়ির দিকে রওনা হলাম।

হাফিজের ঘরের দরজা খোলা। ঢুকে দেখলাম অপরিচিত একজন বসে রয়েছে। এটা একেবারে পরিচিত দৃশ্য। হাফিজের কাছে আসার মানুষের অভাব হয় না। সে আমার দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টি নিয়ে তাকাল। আমি তারদিকে একবার দৃষ্টি দিয়ে কোন কথা না বলে হাফিজের খোঁজে সোজা রান্নাঘরের দিকে রওনা দিলাম।

হাফিজের বাড়িটা রীতিমত স্বয়ংসম্পুর্ন। শোবার ঘর কাম বৈঠকখানা, বাথরুম আর রান্নাঘর সবই আছে। রান্নাবান্নার কাজ সে নিজেই করে। আর আক্ষেপ করে। সাক-সব্জি, ফলমুল, মাছ-মাংশ প্যাকেট করে, টিনের কৌটায় বিক্রি হয়ে কতই না ভাল হত। যারা এগুলো ফলায় তারা ন্যায্য দাম পেত আর যারা ব্যবহার করে তারা নির্ভেজাল খাবার অল্প সময়ে তৈরী করতে পারত।

হাফিজ আপনমনে রান্না করছে। সম্ভবত সব্জি দিয়ে খিচুরী। ঘরের অতিথিকে একনজর দেখে যা বুঝেছি তাতে মনে হয়েছে রাতেও তার সঙ্গি হবে।

গলা নিচু করে হাফিজকে জিজ্ঞেস করলাম, 'এই অবেলায় কি রান্না করছেন ?'

হাফিজ বলল, 'রাতের খাবার। এসে খুব ভাল করেছেন।'

আমি অবাক হয়ে বললাম, 'এখন কি রাতের খাবার খাবেন ?'

হাফিজ বলল, 'রাতে তো খেতে হবে। ফিরতে কত দেরি হবে তার কি ঠিক আছে।'

বক্তব্য বুঝতে সমস্যা হল না। খাবার তৈরী করে অতিথিকে রেখে বাইরে বেরুবে। ফিরবে যত দেরি করে ফেরা যায় তত দেরিতে। সোজা বিছানায় যাওয়ার জন্য। তারমানে অতিথির সাথে আলাপ করার ইচ্ছে নেই।

আমি যথাসম্ভব সহায়তা করলাম তাকে। হাতের কাজ তাড়াতাড়ি শেষ করতে করতে অতিথিকে শুনিয়ে তাকে মনে করিয়ে দিলাম দেরি হয়ে যাচ্ছে। বাইরের জরুরী কাজটা কি সেটা আর উল্লেখ করলাম না। সেও তাড়াতাড়িই কাজ শেষ করল। তারপর রাস্তায় বেরলাম দুজন।

প্রথমেই স্বাভাবিক প্রশ্নটা করতে হল, 'ভদ্রলোকের পরিচয় ?'

হাফিজ বলল, 'একসাথে পড়াশোনা করছি।'

আমি অবাক হয়ে তার মুখের দিকে দেখার চেষ্টা করলাম। সহপাঠির স্বাভাবিক সম্পর্ক যা থাকার কথা সেটা দেখেছি বলে মনে হলনা। অন্যভাবে সেটা জানার চেষ্টা করলাম, 'উনার বৈশিষ্ট ?'

হাফিজ একেবারে নির্লিপ্তভাবে বলল, 'একসময় এন্টিডুরিং মুখস- কইতে পারত।'

আমি আর কথা বাড়ানো প্রয়োজন মনে করলাম না। পাষ্ট টেন্স ব্যবহারের অর্থ সেটা অতীত। এখন হয়ত অন্যকিছু মুখস- বলতে পারবে। অকারনে সময় নষ্ট করে লাভ কি। কবি বলে গেছেন উদ্বাস্তু।

আমার মকবুলের বলা কথা মনে হল। সে দার্শনিকের মত মন্তব্য করে গেছে মানুষ সম্পর্কে। তার অনেক ব্যাখ্যা আমি পাইনি। সে অন্যজগতের মানুষ। এইজগত আর ওই জগতে গড়মিল করে ফেলতেই পারে। হাফিজ পুরোপুরি এইজগতে বাস করে। তাকে অনায়াসে যেকোন প্রশ্ন করা যায়। উদাহরন-ব্যাখ্যাসহ উত্তরও পাওয়া যায়। জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনার কি মনে হয় মানুষ দিনে দিনে খারাপ হচ্ছে ?'

হাফিজ বলল, 'হইব না ক্যান। আপনে চোর-বাটপার-বদমাসগো নিয়া নাটক করেন, সিনেমা করেন, গল্প লেখেন দ্যাখবেন হুড়াহুড়ি পইরা গ্যাছে। যা যা শিখাইবেন সাথেসাথে সেইগুলান কামে লাগাইব। দুইডা ভাল কথা কন কেউ শুনব না। সেইখানে নতুন কিছু নাই। ভাল হইব কি দেইখ্যা। মানুষ সামনে যার ছবি দ্যাখে, যার উদাহরন পায় তারমত হইতে চায়। আমাগো সামনে উদাহরন হইল চুরি-বাটপারি কইরা বড়লোক হওনের।'

একথা আমি আগেও তারমুখে শুনেছি। নতুন কিছু পেলাম না। শুধুমাত্র কথা চালিয়ে যাওয়া জন্যই বললাম, 'তাহলে পথেঘাটে নামিদামি মানুষদের ছবি টাঙানো উচিত।'

হাফিজ উত্তর দিল, 'নামিদামি মানুষের ছবি দেইখাই তো এই অবস্থা। নাম আর দামের বিচার ক্যামনে করবেন সেইডাই কথা। পৃথিবীর মানুষ সন্মান করে এমন বাঙালির নাম করলে পঞ্চাশ বছর একশ বছর পিছনে যাইতে হয়।'

আমি মনে করতে চেষ্টা করলাম বিশ্বখ্যাত বাঙালির। তাড়াতাড়িই তাতে ইস-ফা দিলাম। চিন্তা করে নিজের পা ভাঙার কোন অর্থ নেই।

দুজনে হাটতে হাটতে মুল রাস্তার ধারে এসে পড়লাম। হাফিজের মুখ দেখেই বুঝতে পারছি কোনদিকে যাবে ভাবছে। নিজেই প্রস্তাবটা দিলাম, 'সংসদে গেলে হত।'

হাফিজ যে দৃষ্টিতে তাকাল তাতে তাকে মুখ খোলার সুযোগ না দিয়ে তাড়াতাড়ি যোগ করলাম, 'না-না, সংসদে না। মানে সংসদের ভিতরে না। এখন সংসদ বন্ধ। সংসদের সামনে, এদিক ওদিক বেশ খোলামেলা যায়গা আছে। ধাক্কাধাক্কি ছাড়াই হেঁটে বেড়ানো যায়। রিক্সায় উঠবেন ? দেখুন না চেষ্টা করে। আমি জিজ্ঞেস করলে সবসময় বলে যাব না। আপনাকে কি বলে দেখি।'

হাফিজ বলল, 'আমারেও তাই কইব।'

আমার মাথায় ঢুকল না বিষয়টা। অনেকদিন থেকেই আমি বিষয়টা নিয়ে ভাবছি কখনো সদুত্তর পাইনি। আজ সুযোগ পেয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'কারনটা কি বলুন তো। আপনাকে, আমাকে দেখে কি মনে হয় আমাদের পকেটে ভাড়া দেয়ার মত টাকা নেই। নাকি ভাড়া না দিয়ে চলে যাব। নাকি কম ভাড়া দেব। দুজনের কাউকে দেখেই তো মাস্তান মনে হয় না।'

হাফিজ বলল, 'ভুলডা করছেন ওইখানেই। নিজের চোখ দিয়া দ্যাখছেন। রিক্সাআলার চোখ দিয়া দ্যাখেন তাইলে সমাধান পাইবেন।'

আমার বোধে এল না বিষয়টা। পুরনো প্রশ্নই আবার করতে হল, 'সেই বিষয়টা কি যা দেখে আমাকে এড়িয়ে যেতে পারে।'

হাফিজ বলল, 'এইডারে কয় বাস-ব অভিজ্ঞতা। তারা তাদের কাজে অভিজ্ঞতা-দক্ষতা লাভ করছে, করতাছে এইডা চিন্তা করেন নাই। অহন থিক্যা একটু ভালভাবে লক্ষ করবেন। দ্যাখবেন রিক্সাআলা, দোকানদার মানুষ দেইখাই কইতে পারে কার কাছে কত চাওয়া যাইব, কত পাইব। বেশি টাকা ছাইড়া কম টাকা কে নিতে চায় কন ? রিক্সাভাড়া কত টাকায় বেশি কত টাকায় কম কেউ কইয়া দিছে ? কেউ কয় নাই। আপনে যারে ন্যায্য মনে করেন হেইডা তারকাছে কম। ঝামেলা বাড়াইতে চায় না। আপনার কাছে বেশি চাইলে আপনে হাঁটা দিবেন। বাচ্চা নিয়া একজন মহিলা, মালপত্র নিয়া কোন লোক সেইডা পারব না। আবার প্রেমিক-প্রেমিকা হইলে সুবিধা আরো বেশি। কোন মাইয়ার সামনে কোন পোলা দরদাম কইরা ছোট হইতে চায় না।'

আমি অবাক হয়ে বললাম, 'আপনি গবেষনা করেছেন মনে হচ্ছে।'

হাফিজ বলল, 'গবেষনা দরকার নাই। নিজেরে একটু প্রশ্ন করবেন দেখবেন সব উত্তর সেইখানে পাইবেন। সক্রেটিস কইছিল না, নিজেরে জানো। কথাডার মানে বুইঝেন। ভালমন্দ, ন্যায় অন্যায় সবকিছু নিজের মধ্যে। আমি এক রিক্সাআলাকে দেখছিলাম এক মহিলার সাথে তর্ক করতে। হালার পুতে -'

আমি বাধা দিয়ে বললাম, 'আপনি শুধুশুধু খারাপ ভাষা ব্যবহার করছেন।'

বাধা পেয়ে হাফিজ থেমে গেল। এমনভাবে তাকাল যেন আমাকে নতুনভাবে দেখছে। তারপর বলল, 'অ। আপনে তো আবার গালাগালি পছন্দ করেন না। আপনের এই গুনডা আমি খুব পছন্দ করি। নিজে খারাপ ভাষা ব্যবহার করবেন না, কাউরে করার সুযোগ দিবেন না। আমাগো কথা ছাইড়া দ্যান। পাইকা ঝুনা নারিকেল হইছি, অহন আর শোধরানোর সময় নাই। আর গালি না দিয়া কি করমু কন। চাউলের দাম যত বাড়ে চাউলে পাথরের পরিমান তত বাড়ে। খরচ বাড়ে পাচ টাকা তারা দাম বাড়ায় দশ টাকা, তারপরও হউরের পোলাগো পরান ভরে না। এর ফল কি হইব জানেন ? আপনারে একটা এডভান্স কথা কই- যেই দ্যাশে মানুষ খাবারে বিষ দেয় সেই দ্যাশের সামনে কোন ভবিষ্যত নাই। সামনে আরো অনেক খারাপ দিন আসতাছে।'

আমি কথা ঘোরানোর চেষ্টা করলাম, 'আচ্ছা, চালের পাথর সাপ্লাই দেয় কে বলুন তো ? একেবারে নিখুঁত রঙ, নিখুঁত সাইজ। দাঁতের নিচে পড়ার আগে টের পাওয়া যায় না।'

হাফিজ কিছুক্ষন চেয়ে থাকল আমার দিকে। তারপর হেঁসে ফেলল, 'সাপ্লাই দিবেন ? পারবেন না। এই যোগ্যতা উত্তরাধিকারসূত্রে পাইতে হয়। আপনে যা করতাছেন তাই করেন। খুব ভাল কাম।'

আমি মুখে হতাসা এনে বললাম, 'ভরসা পাই কোথায় ? এই টাকা আসে বিদেশ থেকে। কোনদিন আসা বন্ধ হবে আর আমি কাজ হারাব।'

হাফিজ বলল, 'ঘাবড়াইয়েন না, ঘাবড়াইয়েন না। সমস্যা যত বাড়ব বিদেশিগো দয়া তত বাড়ব। ডলার-পাউন্ড-ইউরো আসতে থাকব। দুইয়ের মইদ্যে মধুর সম্পর্ক। এক যায়গায় কাম হারাইলে অভিজ্ঞতা দেখাইয়া আরেক কাম পাইবেন। চারিদিকে চক্ষু মেইল্যা দ্যাখেন সবাই তাই করতাছে।'

তার কথামত আমি নিজেকে প্রশ্ন করলাম। আর হঠাৎ করে নিজের কাজটাকে খুব আকর্শনীয় মনে হল নিজের কাছে। সত্যিই তো। কজন একাজ করতে পারে। মাঝেমাঝে মনে করেছি কোন ব্যবসায় হাত দেব, হাফিজ করতে দেয়নি। ওর এবিষয়ে এককথা। এদেশে ব্যবসা করতে হয় প্রথম ধাক্কায়। অন্যরা হুমড়ি খেয়ে পড়ার আগেই লাভ করে নিতে হয়। আমি কখনো তেমন ব্যবসার সন্ধান পাইনি। যে ব্যবসার কথা চিন্তা করি সেটার তখন মরণ দশা। যাদের লাভ করার তারা লাভ করে ব্যবসা গোটাচ্ছে আর যাদের লোকসান দেয়ার তারা ছুটছে ব্যবসা খুলতে। তারচেয়ে আমি অনেক ভাল আছি। রীতিমত সন্মানজনক কাজ। মাঝেমাঝে ঝাড়ি নিয়ে বলতে পারি, করব না এই কাজ। পারলে অন্যকে দিয়ে করান। বেদনানাশক ওষুধের কাজ করে কথাটা। তারমানে কাজ গেলে আমার ক্ষতি যতটা ওদের ক্ষতি তারচেয়ে বেশি। বেশ তো।

নিজেকে আরেকবার প্রশ্ন করতেই মনটা খারাপ হয়ে গেল। আমি কি রিক্সাচালক-দোকানদারের মত হয়ে যাচ্ছি? কি করলে বেশি লাভ হবে সেই পথে যাচ্ছি? একটু আগে তো ওদের দোষ ধরলাম এই কারনেই। সেকি তখন নিজে ভুক্তভোগিদের দলে ছিলাম সেকারনে ? এখন অবস্থান বদলের সাথেসাথে পুরো নীতিবোধটাই যে উল্টে যাচ্ছে!

বিষয়বিহীন চিন্তা বিষয়টাই খারাপ। চিন্তা করলেই খারাপ খারাপ বিষয় এসে ভালকে ঠেলে সরিয়ে দেয়। এরচেয়ে কারো সাথে আলাপ করা ভাল। হাফিজের মত কেউ থাকতে খারাপ

বিষয় মাথায় ঘুরপাক খাওয়ানোর কোন অর্থ হয় না। আমি জোর করে চিন্তা বিদায় করলাম। বরং সামনের বিষয়ে মনোযোগ দেয়া যাক। ঋষি টলষ্টয় বলে গেছেন সামনের ব্যক্তি সবচেয়ে গুরুত্বপুর্ন ব্যক্তি, বর্তমান কাজ সবচেয়ে গুরুত্বপুর্ন কাজ, বর্তমান সময় সবচেয়ে গুরুত্বপুর্ন সময়।

আমি হাফিজকে সরাসরি জিজ্ঞেস করলাম, 'এই যে হাজার হাজার মানুষ ভিড় করে এদিক ওদিক যাচ্ছে। আপনার কি মনে হয় বলুন তো। এরা সবাই কাজে ঘুরছে ? আমার মনে হচ্ছে অনেকে কিছু না ভেবেই অকারনে ঘুরে বেড়াচ্ছে।'

হাফিজ বলল, 'মানুষ হইল একেকটা গ্রহের মত। গ্রহ যেমন নিজে ঘুরপাক খায়, তারপর সুর্যের চারিদিকে পাক দেয়। সুর্য আবার সবাইরে নিয়া মহাশুন্যে ঘুরতে থাকে, ঠিক তেমনি। সকলে প্রথমে নিজের ধান্দা নিয়া হিসাব কষে, তারপর আরেকটু বাড়লে পরিবার-আপনজনরে নিয়া মাথা ঘামায়, আরেকটু বাড়লে সমাজ নিয়া মাথা ঘামায়। কেউ কেউ আরো উপরে উইঠা পৃথিবী নিয়া মাথা ঘামায়। সবকিছু একসাথে মিলা জটিল সমীকরন তৈরী করে। গ্রহ নক্ষত্রের হিসাব মেলে, মাইনষের হিসাব কখনো মেলে না। নিজের হিসাব যখন একেবারে গড়মিল হয় তখন সেইটা বাদ দিয়া অন্য হিসাব নিয়া খোঁচাখুচি করে। ভাবতে শুরু করে সব দোষ অন্য যায়গায়। সকলে ঠিকমত চললে তার এই দুরবস্থা হইত না।'

একবার মনে হল আমাকেই বলছে কথাটা। আমি কেন অন্যদের নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছি। অকারনে রাস্তায় হেঁটে ভিড়ই বা বাড়াচ্ছি কেন। যদিও অভিজ্ঞতা থেকে জানি হাফিজ আমাকে অপদস্থ করে কিছু বলবে না। একজন শিশু ভুল করলে যেমন তাকে বুঝিয়ে দেয়া হয় সেভাবেই বুঝাবে। তারপরও নিশ্চিত হতে পারলাম না।

হাফিজ তখনও সেই প্রসংগে বলে যাচ্ছে, 'চারিদিকে চাইয়া দ্যাখেন, মানুষ কাম করতে চায়। কেউ কাম দেয় না। কেউ নিজে করতে চাইলে হাজাররকম বাধা। কোন সমাজে যখন মানুষ কাম করতে চায় আর তাগো কামে লাগান যায় না তারমত দুর্ভাগা সমাজ নাই।'

আমি আপত্তি করে বললাম, 'আপনি একদিন বলেছিলেন চাকরী খোঁজা যত কষ্টের, যারা চাকরী দেয় তাদের যোগ্য মানুষ খোঁজা তারচেয়ে কষ্টের।'

হাফিজ বলল, 'অহনও কই। আপনে কাগজপত্র, সার্টিফিকেট আত্মবিশ্বাসের ওপর চাকরি দিলে নিজের পায়ে কুড়াল মারবেন। কাজ করতে দিলে কইব, অন্য সব কাজ পারি এইডা পারি না।'

আমার আরো ইচ্ছে ছিল এবিষয়ে আলাপ করার কিন' চারিদিকের চাঞ্চল্য দেখে থামতে হল। সব লক্ষন বলে দিচ্ছে সামনে কিছু ঘটেছে। এবং এখনো ঘটছে। কোন কোন গাড়ি উল্টোদিকে যাত্রা করেছে। অঘোষিত কোন নিয়মে কোন সংঘর্ষ ছাড়াই রাস্তা গাড়িশুন্য হয়ে গেল। দোকানের ঝাপি বন্ধ হচ্ছে শব্দ করে। সাংবাদিকেরা একে উল্লেখ করেন ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া বলে। ফুটপাতের দোকানে দামাদামি থেকে হাতাহাতি, কোন মেয়েকে উত্যক্ত করা থেকে হাতাহাতি, অমুক ভাইয়ের মুক্তি চাই দাবি থেকে গাড়ি ভাঙা, কিংবা কারো গাড়িতে নিজস্ব গতিতে চলতে বাধা দেয়া যেকোন কিছুই এর উৎস হতে পারে। আমার নতুন করে অভিজ্ঞতা লাভের ইচ্ছে নেই। আর হাফিজও বহু আগে উৎসাহ হারিয়েছে এতে। কাজেই উল্টোদিকে হাটতে হল।

তখনো ঘুমের আমেজ যায়নি। শুয়ে থেকে হিসেব করছি আর কত মিনিট পর উঠলে নিজের সব কাজ সেরে সময়মত অফিসে পৌছাতে পারব। এমন সময় দরজায় ঠক ঠক শব্দ।

এমন আসে- করে ভদ্রভাবে নক করার ঘটনা সচরাচর ঘটে না। কোনমতে জামাটা গায়ে চড়িয়ে দরজা খুলে দেখি আনিস। একেবারে হাস্যোজ্জ্বল মুখ।

আমার অপ্রস্তুত চেহারা দেখে বিব্রতভাবে জিজ্ঞেস করল, 'সমস্যা করলাম না-তো?'

আমি সাদর আমন্ত্রন জানালাম তাকে, 'আরে এখানে আবার সমস্যা কিসের ? আসুন, ভেতরে আসুন ?'

ঘরে ঢোকার যায়গা করে দিলাম। আনিস ঘরে ঢুকল। আমি দরজা টেনে দিয়ে বললাম, 'অসময়ে কেউ এলে প্রথমেই দুঃসংবাদের আশংকা করি। আপনাকে দেখেই বোঝা যাচ্ছে সুখবর এনেছেন। বিষয়টা কি ?'

'কইতাছি।' বলে বিছানায় বসল আনিস। হাত বাড়িয়ে পানির বোতলটা নিয়ে পানি খেল একটু। তারপর কোন কথা না বলে হাসিমুখ করে বসে থাকল সেখানেই।

আমার তর সইছে না। কি এমন খবর যা দেবার জন্য এত প্রস্তুতি নিতে হয়। জিজ্ঞেস করলাম, 'ব্যাপারটা কি বলুন তো-'

আনিস একেবারে হঠাৎ করেই বলল, 'প্রকাশকের ডাক পাইছি।'

'তারমানে!' চমকে উঠলাম আমি, 'আপনার বই ছাপা হচ্ছে?'

আনিস লাজুকভাবে হাসল, 'অহনও ফাইনাল না। অনেকদিন আগে লেখা দিছিলাম। আইজ কথা কওনের জন্য ডাকছে। ভাবলাম আপনারে জানাই। একা যাইতে কেমুন জানি লাগতাছে।'

আমি সাথেসাথে উৎসাহ দিলাম তাকে, 'আরে নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই। অমুক কবি আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু একথা কয়জন বলতে পারে ? চলুন, আমি সাথে আছি। কখন যেতে বলেছে ?'

আনিস বলল, 'কইছে বারোটা-সাড়ে বারোটা।'

আমি ঘড়ির দিকে তাকালাম, 'বারোটা-সাড়ে বারোটা। তারতো অনেক দেরী। এখন নটাও বাজেনি। এতক্ষন কি করবেন ?'

আনিস আমতা আমতা করল। বলল, 'আপনারে খবরটা আগেই দিলাম। যদি আবার অন্য কাজে ব্যস- থাকেন। আসলে মনডা ক্যামুন জানি লাগতাছে। আইজকার দিনডাও কেমুন জানি। উড়--উড়-।'

আমার বুঝতে সময় লাগল না। আসলে তার মনটাই উড়- উড়- করছে। এত বছর ধরে যে স্বপ্ন দেখে এসেছে এখন সেটা দোরগোড়ায়। পরীক্ষার ফল বেরনোর আগে ছাত্রের যে অবস্থা হয় তার সেই অবস্থা। নিজেকে সি'র রাখতে পারছে না।

আমি বললাম, 'আচ্ছা, ঠিক আছে। আপনি খেয়েছেন কিছু ? চলুন দোকানে পরোটা-ভাজি খেয়ে নেব। তারপর অফিসে কিছু কাজটাজ করে সময়মত একসাথে যাব।'

আমি অনুমান করেছিলাম প্রকাশক হবেন বেশ বয়স্ক। হয় ক্ষীন শ্বাসে'্যর নয়ত অতিরিক্ত মোটা। চোখে মোটা চশমা, চালচলনে ভারিক্কি। পরিবর্তে যাকে দেখলাম তিনি রীতিমত ছোকড়া। ষ্টাইল করা পোষাক-চেহারা। অনায়াসে কোন বড় কোম্পানী সেলস রিপ্রেজেন্টেটিভ হতে পারেন। বসার যায়গাটিও রীতিমত ঝকঝকে তকতকে। বইপত্র ছাপার বিন্দুমাত্র ছাপ পরতে দেননি।

আমরা বসলাম। আনিস অধৈর্য্য হয়ে অপেক্ষা করছে ওপাশের বক্তব্য শোনার। তিনি যেন ইচ্ছে করেই দেরী করছেন সুখবরটা দিতে। বেশ কিছুক্ষন চলল এই ধৈর্য্য পরীক্ষা। একসময় আনিসকেই মুখ খুলতে হল, 'খবর কি তাহলে ?'

তিনি গলা পরিস্কার করলেন। একেবারে বিশুদ্ধ উচ্চারন। যেন কোনমতেও একটি অক্ষর ভুলভাবে তার মুখছাড়া না হয়।

তিনি বললেন, 'দেখুন, আমাদের এটা অত্যন্ত বড় প্রতিষ্ঠান। সব বেষ্টসেলার লেখকরা আমাদের কাছে বই দেন। আমরা সাধারনত নতুন লেখকদের বই ছাপি না।'

আমি আনিসের মুখভঙ্গি লক্ষ্য করছি। ক্ষনে ক্ষনে সেটা পাল্টাচ্ছে।

তিনি বললেন, 'সেক্ষেত্রে আমরা কিছু নিয়ম মেনে চলি। ছাপার খরচটা লেখককে দিতে হয়। অবশ্য বিক্রি হলে আপনি রয়্যালটি পাবেন। এবিষয়ে আমরা সুনাম রক্ষা করে চলি।'

আনিস জিজ্ঞেস করল, 'লেখাটা পড়ছেন ?'

তিনি বললেন, 'মানুষ আসলে লেখকের নাম দেখে বই কেনে। পাঠকের হাতে বই পৌছানোই মুল কথা। সেজন্যই এই ব্যবস্থা করতে হয়। আমাদেরও তো ব্যবসার কথা মাথায় রেখে চলতে হয়। তারপরও আমরা সবসময় নতুন লেখকদের উৎসাহ দেই।'

আনিস আবার জিজ্ঞেস করল, 'আপনে লেখাটা পড়ছেন ?'

তিনি বললেন, 'পুরোটা পড়ার সময় পাইনি। তবে দেখেছি। আপনি এসব নিয়ে ভাববেন না। সব ঠিক হয়ে যাবে।'

আমার যদি বুঝতে ভুল না হয় তাহলে আনিস তার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে। সে এখানে বই ছাপতে দিচ্ছে না।

ভদ্রলোক তখন বলছেন, 'বইয়ের ব্যবসায়ও এখন কম্পিটিশান খুব বেশি। ফুটপাত ব্যবসায়ীরাও অনায়াসে বই ছেপে বিক্রি করে। আজকাল টেকনোলজী এত উন্নত হয়েছে-'

আনিস বলল, 'আমার লেখাটা কোথায় ?'

তিনি বললেন, 'আপনার লেখার পিছনে আরো কিছুটা খরচ করাতে হবে। আমি দেখেছি সেখানে কিছুটা ব্যাকরনগত ত্রুটি রয়েছে।'

আনিসের মুখে বিদ্রুপের হাসি দেখলাম মুহুর্তের জন্য। সে বলল, 'সে তো দেখবেনই। আপনে হইলেন ব্যাকরন শিং বিএ।'

তিনি বললেন, 'আমি এমএ।'

আনিস বলল, 'তাইতেও চলে। ব্যাকরনরে ম্যাকরন কইলেই হয়। আচ্ছা, যাউকগা। আমারে লেখাটা ফেরত দ্যান।'

তিনি বললেন, ‘আমরা লেখা ফেরত দেই না। সবসময় বলে দেই লেখা কপি রেখে জমা দিতে।’

আনিসের ধৈর্য্য সীমা ছাড়িয়ে গেছে। সে বলল, ‘তারপর কি করবেন ? জমাইয়া কেজিদরে বেচবেন ?’

তিনি সাথেসাথে আপত্তি করলেন, ‘আরে না-না। আজকাল পুরনো কাগজের এত দাম নেই। আমরা কোন লেখা হারাই না। সব জমিয়ে রাখি। আপনি নিশ্চয়ই জানেন কেউ একবার বিখ্যাত হলে তার জিনিষপত্রের দাম কেমন বাড়ে। নেপোলিয়নের একটা চিঠি-’

আনিস বলল, ‘হ, বুঝছি। চলেন যাইগা।’

বলে তারদিকে একবারও না তাকিয়ে আমার হাত ধরে টেনে উঠিয়ে বাইরে এনে ফেলল।

আমি আনিসের মনের অবস্থা বুঝতে পারছি। ওকে একা ছাড়তে ইচ্ছে হল না। বললাম, ‘চলুন আমার সাথে। আমি কিছুক্ষন কাজ করব অফিসে তারপর একসাথে খাওয়া-দাওয়া করব, বিকেলে একসাথে ঘুরব। অনেকদিন আপনার সাথে ঘোরা হয় না।’

আনিস আপত্তি করল না অফিসে যেতে। বেশ কয়েক মিনিট বসে থাকল। তারপর হঠাৎ করেই উঠে সব আপত্তি উপেক্ষা করে চলে গেল।

আমি চেষ্টা করেও কাজে মন বসাতে পারলাম না। আনিসের বিষয়টা ক্রমাগত খোঁচা দিচ্ছে মনে মধ্যে। কত আগ্রহ নিয়ে সে সাতসকালে এসে হাজির হয়েছিল আমার ঘরে। আর-

স্বাভাবিকের চেয়ে আগেই বেরলাম অফিস থেকে। হাটতে হাটতে বাড়ি। সেখানেও বেশিক্ষন থাকতে পারলাম না। আবারও জামা গায়ে চাপিয়ে চায়ের দোকানে হাজির হলাম। আমি দোকানে পৌছার আগেই সবসময় চা তৈরী হয়ে যায়। আজও তার ব্যতিক্রম হল না। অনবরত দ্রুতহাতে চা বানাচ্ছে, কার কি প্রয়োজন সবদিকে লক্ষ রাখছে, সাথে মুখও চলছে। সকলের সাথে সুসম্পর্ক। কারো কারো সাথে রীতিমত বন্ধুত্ব। এমন একজন জিজ্ঞেস করল, ‘কি বাজাইতাছেন কাণের কাছে ?’

দোকানদার বলল, ‘শুনতাছেন না। ক্রিকেট খেলা।’

সে বলল, ‘হ্যাহ। পঙ্গু মাইনষের খেলা।’

দোকানদার রীতিমত রেগে গেল তার কথা শুনে। ক্রুদ্ধভাবে বলল, ‘ক্রিকেট পঙ্গু মাইনষের খেলা? পঙ্গু মানুষ ক্রিকেট খেলে ?’

সে আরো দাঁত বের করল, ‘যাগো হাত নাই, পাও নাই কিছু করতে পারে না তারা সারাদিন ঘরে বইসা ক্রিকেট খেলা শোনে। কাইলকা রেসলিং দেখছিলেন। কি মাইরডা যে দিল রে ভাই।’

পাশ থেকে আরেকজন এগিয়ে এল তার আলোচনায় যোগ দিতে, ‘কেডা? আন্ডারটেকার ?’

সে একজন সমর্থক পেয়ে তারদিকে ঘুরে বলল, ‘দ্যাখছেন আপনে ?’

একজন রিক্সাচালক ক্রিকেটের সমর্থনে এগিয়ে এসে দোকানদারকে জিজ্ঞেস করল, 'বাংলাদেশ ব্যাট বাইড়ায় না ঢিলায়?'

আমি চায়ের কাপটা ফেরত দিয়ে টাকা দিয়ে ঘুরে হাঁটতে শুরু করলাম। বেশ কিছুক্ষন হেঁটেও ঠিক করতে পারলাম না কোথায় যাব। এইসময় হাফিজকে পাওয়ার সম্ভাবনা কম।

তারচেয়ে বরং নিলক্ষেতে ঘুরে আসি। একসময় আমি সেখানকার নিয়মিত যাত্রী ছিলাম। পুরনো বইয়ের মধ্যে থেকে বেছে বেছে বের করতাম যাকিছু পাওয়া যায়। সবাই চিনে গিয়েছিল আমাকে। আমিও এখানে বই কেনার নিয়মকানুন শিখেছি ভালভাবেই।

হঠাৎ করেই মনে পড়ল আনিসের সাথে আমার পরিচয় এখানেই। আর কি অবাক কান্ড-, হঠাৎ করেই চোখে পড়ল আনিস দাঁড়িয়ে।

আমাকে দেখতে পায়নি। একটা বই হাতে নিয়ে একমনে দেখছে। এখন পুরনো বই পাওয়া যায় না, সব নতুন হয়ে গেছে। যে দুএকটা অবশিষ্ট আছে তারই একটার সামনে।

আমি ভাল করে দেখলাম ওকে। পোষাক দেখে বোঝার উপায় নেই তবু আন্দাজ করলাম দুপুরে বাড়ি যায়নি। সাতসকালে আমার ওখানে গেছে, তারপর প্রকাশকের কাছে। তারপর মন খারাপ করে পথেপথে ঘুরছে। হয়ত খায়নি দুপুরে।

আমি কাছে গিয়ে পিছন থেকে উকি মারলাম। কবিতার বই। আনিস আমার উপসি'তি টের পেল না। এমনকি আমি যখন তার হাতের বই উল্টো করে বইয়ের নাম দেখলাম তখনও সে বিরক্ত হল না। আবারো হাত সোজা করে বই দেখতে থাকল।

আমি জোরে বললাম, 'হুঁ।'

এতক্ষনে আনিসের সম্বিত ফিরল, 'আরে আপনে ?'

আমি বললাম, 'হ্যাঁ, আমি।'

আনিস বোকার মত হাসল। বইটা বন্ধ করে আমাকে প্রচ্ছদ দেখাল, 'ওর কবিতার বইয়ের খুব শখ। মাঝেমাঝে কিনি।'

আমার বিশ্বাস হল না। আমি যতদুর জানি তার বউ কলেজে পড়ত। বিয়ের সাথেসাথে সেখানেই পড়ালেখার ইতি। সে যতই কবিতা পছন্দ করুক জিবরানের কবিতার অনুবাদ পড়ার কথা না। আসলে বউয়ের নাম ভাঙিয়ে নিজের জন্যই কিনছে।

আমি বই কেনার পুরনো পদ্ধতি কাজে লাগানোর চেষ্টা করলাম। বইটা তার হাত থেকে নিয়ে সামনে ছুড়ে দিয়ে দোকানদারকে শুনিয়ে বললাম, 'ধুর, এটা একটা বই হল নাকি। এ বই দশ টাকায় কিনলেও লস। ছিড়ে মুড়ি খাওয়া ছাড়া আরকিছু হবে না। আমি বই খুঁজে দেই। দেখি ওই বইটা।'

দোকানদার নিশ্চয়ই দামের হিসেব কষছিল। সে খুবই বিরক্ত হয়েছে আমার ওপর। সে সরাসরি চ্যালেঞ্জ করে বসল, 'কিনবেন ?'

আমাকেও উত্তর দিতে হয়। আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'বেচবেন ?'

সে বিরক্তি দেখিয়ে বলল, 'তাইলে কি আন্ডা পাড়তে বইছি ?'

আমি বললাম, 'আন্ডা খুব দামী জিনিষ। হালি কত ?'

দোকানদার বোধহয় বুঝল কথায় সুবিধে হবে না। আশেপাশে আরো দুয়েকজন জড়ো হয়েছে, হাসাহাসি করছে। আমি আনিসের পছন্দের বই দেখিয়ে বললাম, 'টাকা দিয়া এইডা কিনতাম না। বাড়ি নিয়া যান, মাথার নিচে দিয়া ঘুমাইবেন। জ্ঞান বাড়ব।'

দোকানদার কটমট করে তাকাতে লাগল। আনিস মন খারাপ করে রয়েছে। বোঝা যাচ্ছে বইটা হাতছাড়া করতে চায় না।

আমি পুরনো পদ্ধতিতে গেলাম, 'সবচেয়ে সস্তা বই কোনটা ?'

দোকানদার কোন কথা বলল না। আমি বললাম, 'কি- বই দিয়া ভীড় কমাইবেন না এই ঠেলাঠেলি দ্যাখবেন। পুলিশ আইলে বিশ টাকা। বেশিও লাগতে পারে।'

এবারেও সে নিরুত্তর।

আমি নিচু হয়ে বইটা হাতে তুললাম, 'বুঝছি, মাথা খেলতাছে না। চোর পালাইলে বুদ্ধি বাড়ে। লন বিশ টাকা। টাকাটাই পানিতে গেল। আমার জন্য একহালি ডিম রাইখেন। সামনের সপ্তায় আমুনে। এই যে, আপনেরা সাক্ষি-'

পাশের লোকদের সাক্ষি বানিয়ে আনিসকে আরকিছু বলার সুযোগ না দিয়ে ওর হাত ধরে ভীড়ের বাইরে এনে ফেললাম। আনিস হতভম্ভ।

আমি বইটা তার হাতে দিয়ে বললাম, 'এতদিনেও বই কেনা শিখলেন না। দামাদামি না করে কখনো বই, ওষুধ এসব কিনবেন না।'

আনিস বইটা আরেকবার দেখে নিয়ে তার ব্যাগে ঢুকাল। আমরা ভীড় থেকে বেরিয়ে রাস্তায় এসে দাঁড়ালাম। আসলে ভীড় এখানে কম না বেশি বলা কঠিন। রাস্তার দুপাশে নানা ধরনের দোকান, নানারকম গাড়ি থেমে রয়েছে, মাঝখানের গাড়িগুলো সামনে যাওয়ার পথ না পেয়ে গায়ের ওপর এসে পরে। সকলেরই পথের ওপর সমান অধিকার, শুধু হাঁটামানুষ বাদ দিয়ে। এতকিছুর পরও আমি মনে স্বসি- পাচ্ছি আনিসকে দেখে। ও সকালের কথা ভুলে গেছে।

হাঁটতে হাঁটতে জিজ্ঞেস করলাম, 'খুব আগ্রহ নিয়ে যে বইটা কিনলেন। কেমন বই?'

আনিস বলল, 'একেবারে ফাটাফাটি।'

আমি ভ্রু কোচকালাম, 'কি ?'

উত্তরে আনিস দাতে জিভ কাটল, 'এই-রে, আপনের কাছে কথা কওয়ার বিপদ। খালি ভূল ধরেন। এইডা হইল মডার্ন ভাষা। আপনে অহনো বিদ্যাসাগর-রবীন্দ্রনাথের যুগে রইছেন। চারিদিকে একবার চাইয়া দ্যাখেন সবকিছু কত ফাষ্ট চলতাছে। ইন্টারনেটের যুগে ইন্টারনেটের মত ফাষ্ট চলবেন।'

আমি গো ছাড়লাম না, 'কিন' কথাটার মানে কি ? প্রায়ই এর ওর মুখে শুনি। ফাটাফাটি জিনিষটা কি ভাল ?'

আনিস অসহায়ের মত মুখভঙ্গি করল এবার, 'ক্যামনে যে আপনারে বুঝাই। এমনে বেশিদিন টিকতে পারবেন না। ছিটকাইয়া পড়বেন। আজকাল ছোটছোট পোলাপানও জানে কি শিখতে হয়। আপনে নিজেরে আপডেট করেন। তাইলে এইসব প্রশ্ন করবেন না।'

'আপডেট করব ?'

'আবার জিগায়।'

আমি বললাম, 'আচ্ছা যাকগে ওসব। আমার মনে পরেছে হাফিজের পরিচিত এক প্রকাশক আছে। যাবেন নাকি একদিন? আরে ছাপা হওয়াটাই আগে। হাতে জিনিষ থাকলে তবে তো কাউকে দেখানো যায়। সেদিন দেখলাম একজন আপনার বই নিয়ে বিক্রি করতে বসেছে, পরদিন দেখলাম একটাও নেই। তারমানে সব বিক্রি হয়ে গেছে। কদিন পর আপনার বই দেখেও লোকে বলবে একেবারে ফাটাফাটি।'

আনিস হাসতে হাসতে বলল, 'খারাপ কন নাই। তাইলে শোনেন, এইসব কবিতা টবিতার যুগ নাই। এগুলান মানুষের কোন কামে আসে না। সুকান্ত কইছিল পৃথিবী গদ্যময়, অহন গদ্যও নাই। মানুষ খোঁজে কোন জিনিষটা নিজের কামে লাগব। ভাইবা দেখতাছি সেইরকম কিছু করা যায় কিনা।'

আমি বললাম, 'নিজের রোগ নিজে সারাই, কি করিলে কি হয়, টাকা উপার্জনের সহজ উপায়, জান্নাতবাসি হওয়ার সহজ উপায় থেকে শুরু করে প্রেমিক-প্রেমিকার এসএমএস গাইড পর্যন্ত বাজারে দেখেছি। তারচেয়ে উপকারী কিছু করতে হলে গালাগালির ডিকশনারী তৈরী করতে হয়। কিংবা এনসাইক্লোপিডিয়া। আমেরিকা ইউরোপে আছে। এখানে এখন পর্যন্ত কেউ করেনি। অন্তত আমার চোখে পড়েনি।'

আনিস আপত্তি করে বলল, 'হ। আপনে একটা জাতিরে কলংকিত করতে চান।'

আমি নিজের পক্ষে সাফাই গাইতে চেষ্টা করলাম, 'কেন, অধিকাংশ মানুষ গালাগালি না করে কথাই বলতে পারে না। সবাই যদি গালাগালি করেই তাহলে যার প্রয়োজন সে দেখে নেবে। দক্ষতা বাড়াবে। লিখলে জাতি কলংকিত হবে কেন ?'

আনিস বলল, 'হইব, হইব। আপনে চুরি করবেন করেন তাই বইলা সেইডা প্রচার করবেন ? অন্য লোকে শুনলে মান যায় না ? জাতির নামে কখনও খারাপ কইতে নাই। সত্য হউক, মিথ্যা হউক তাতে কিছু যায় আসে না। বাপ পোলারে কইব হালার পুত, পোলা বাপরে কইব হালার পুত। এতে কোন দোষ নাই। আমি আগেই সাবধান করতাছি এমন কিছু করতে যাইয়েন না। আপনারে দেহায়া দিব গালাগালি কারে কয়। জীবনডাও যাইতে পারে। যদি কিছু কইতে চান কইবেন এই দেশের সব মানুষ সহজ সরল, ধার্মিক, কর্মঠ, মেধাবী। কখনো কামে ফাঁকি দেয় না, ধান্দাবাজি করে না। একজন একজন কইরা জিজ্ঞাস করবেন দেখবেন পনের কোটির মধ্যে একজনও চোর, ধান্দাবাজ নাই। অন্যদেশের লোকে যাকিছু কয় তা হইল শত্রুতা। পরের ভালো সহ্য করতে পারে না।'

আমি হাল ছেড়ে দিয়ে বললাম, 'এটা নিশ্চয়ই আপনার মনের কথা না। আচ্ছা একটা কথা বলুন তো, এই যে আপনি লিখছেন অথচ পাঠকের কাছে পৌছাতে পারছেন না। প্রকাশক আপনার লেখা না পড়েই না বলে দিচ্ছে, এজন্য মন খারাপ হয় না ?'

আনিস বলল, 'মন খারাপ করমু কেন? এইযে আমি বাইচা রইছি, সুস্থ্য রইচি, আপনের মত একজনের সাথে কথা কওয়ার সুযোগ পাইছি, তারপর আবার দুঃখ কিসের ? কতজন আমার চেয়ে কত খারাপ অবস্থায় রইছে। শোনেন, এইসব ছোটখাট বিষয় নিয়া যত ভাববেন তত খারাপ লাগব। আমাদের দেশে মানুষ অনেক দেশের মানুষের চাইতে ভাল। যখন দ্যাখে খারাপ কাজ করলে কেউ বাধা দেয় তখন এইসব করে। এইদেশে মানুষরে নিয়ম মানান খুব সহজ। যাদের সেই দায়িত্ব তারা খারাপ কাজ করে, অন্যরা শেখে। এইসব নিয়া মনখারাপ করি

না। একদিন ভাল হইব। সবকিছুরই নির্দিষ্ট একটা গতি আছে। চেষ্টা করলে সেই গতি বাড়ান যায়, কমান যায়। বিপরীত দিতে লওয়া যায় না। সব সমাজেই ভাল-খারাপ দুইরকম সময় রইছে। দুর্ভোগে পরলে মাঝেমাঝে মনডা দুর্বল হয়। আরেকজনের দায়িত্ব লইছি তো। তখন আপনের কথা মনে করি, হাফিজ ভাইয়ের কথা মনে করি আর মনে বল পাই। আপনেরা থাকতে আমার কোন চিন্তা নাই। চিন্তার কোন কারন নাই। মানুষ নিজের চিন্তা বাদ দিয়া অন্যের চিন্তা করে এইজন্য দুঃখ বাড়ে।'

একেবারে হাফিজের কথার পুনরাবৃত্তি। আমি বললাম, 'তারমানে কে কি করছে দেখা প্রয়োজন নেই। চোখকান বন্ধ করে থাকতে বলছেন।'

আনিস বলল, 'তাইলে শোনেন। এক লোকের খুব শখ অন্যের মনের কথা জানব। একদিন বাড়ি ছাইড়া এক সাধুর কাছে গ্যাছে। তার খুব সেবাযত্ন করছে। সাধু তারে জিগাইছে কি বর নিবা। সে কয় পরের মনের কথা জানতে চাই। সাধু তারে বারবার নিশেধ করায়ও শোনে নাই। তারপর আর কি-, সাধু তারে দিছে সেই বর। সে বাড়ি ফেরার জন্য ট্রেনে উঠছে। পাশে বসা লোকটার মনের কথা জানার শখ হইছে। শোনে পাশের লোকটা মনেমনে কইতাছে, চোর-পকেটমার নাকি রে বাবা, এত যায়গা থাকতে এইখানে আইসা বসল। সে কোনমতে নিজেরে সামলাইয়া বাড়ি ফিরছে। বাড়ির দারোয়ান তারে দেইখা সালাম দিছে। সে কান পাইতা দারোয়ানের মনের কথা শোনে, সে কইতাছে- দুইদিন একটু ভাল আছিলাম, আবার আইল হালায়। একটু শানি-তে যদি থাকতে দ্যায়। সে সেইডাও সহ্য কইরা বাড়িতে ঢুকছে। দ্যাহে তার বউ তারে দেইখা মনে মনে কইতাছে- আর দুইদিন বাইরে থাকতে পারলনা--। যাউকগা ওসব। এই হইল ব্যাপার। সব এই নিয়মেই চলতাছে। সকলেই অন্যে কি করে তাই নিয়া চলতাছে।'

আমি বললাম, 'এ দেখি হাফিজের কথা। হাফিজ বলে সকলে অন্যের সমস্যা সমাধানে ব্যস-। কার কি করা উচিত সেই পরামর্শ দেয়। নেতা, প্রেসিডেন্ট, প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে বুশ-ব্রাউন পর্যন্ত। শুধু নিজের যা কর্তব্য সেটা দেখা প্রয়োজন মনে করে না। '

আনিস বলল, 'তাইলে শোনেন। একজন একটা পুরান গাড়ি কিনল। শুইনা তার এক বন্ধু জিগাইছে গাড়ির কন্ডিশন কি। সে কয়, গাড়ির সব যায়গা থিকা শব্দ বাইর হয়, হর্ণটা বাদ দিয়া।'

সেই মুহূর্তে বিকট একটা হর্ন আমাদের কানের পোকা নড়িয়ে দিল। ঘাড় ঘুরিয়ে দেখার চেষ্টা করলাম। রাস্তার পাশে দুই-তিন সারি গাড়ি থামানো। একজন ট্রাফিক পুলিশ দাঁড়িয়ে। সেও এগিয়ে গিয়ে গাড়ির চালককে দেখল। আমিও দেখলাম। আর-

এই চেহারা আমি জীবনে ভুলব না। এ সেই চালক। শয়তানের নম্বরের গাড়ি চালায়। মকবুলকে ধাক্কা দিয়ে মেরেছে। আমাকে ধাক্কা দিতে চেষ্টা করেছে। আমাকে যখন ধাক্কা দিতে যাচ্ছিল তখন মুখ দেখতে পাইনি। মকবুলকে যখন ধাক্কা দেয় তখন দেখেছি। এখান থেকে গাড়ির নাম্বার দেখা যাচ্ছে না। কিন' আমি নিশ্চিত, গাড়িটা বের হলেই আমি সেই নাম্বার দেখতে পাব।

ট্রাফিক পুলিশ অন্য গাড়ি সরিয়ে তার বের হওয়ার পথ করে দিচ্ছে। আমি আনিসের দিকে তাকিয়ে আসে- করে বললাম, 'ওই গাড়িটা আমার এক বন্ধুকে চাপা দিয়ে মেরেছে।'

আনিস ঘুরে তাকাল গাড়িটার দিকে। গাড়িটা মাথা বের করেছে। তারপরই আমাদের সামনে দিয়ে এগিয়ে গেল। আনিস ঘুরে তাকিয়ে থাকল সেদিকে।

আমি আনিসের হাত ধরে অন্যদিকে ঘুরানোর চেষ্টা করলাম। তার শরীর ঘুরে গেলেও দৃষ্টি সেই গাড়ির দিকে। হঠাৎ করেই যেন যে অন্য আরেকজন হয়ে গেছে।

আমি কি বলব খুঁজে পেলাম না। আনিস সবসময়ই হাসিখুশি। কোন কারনেই ওর মুখ থেকে হাসি যায় না। শত বিপদের মধ্যেও সে আশার আলো দেখে। সকালে প্রকাশকের কাছ থেকে বিফল হয়ে ফিরেও সেটা অনায়াসে ভুলে গেছে। এখন সেই মুখ থমথমে। গাড়িটা সামনে মোড় ঘুরে উল্টোদিকে যাচ্ছে। যতক্ষন দেখা যায় তাকিয়ে থাকল গাড়িটার দিকে।

বিষয়টা বুঝে আমার নিজের ওপরই বিরক্তি এসে গেল। কি প্রয়োজন ছিল ওকে একথা বলার ? এই গাড়ির চালক কি করেছে তাতে এখন আর কি আসে যায় ? মকবুল তো মরেই গেছে। তাকে কি আর ফেরত পাওয়া যাবে ? এপথে যে যায় সে চিরদিনের জন্যই যায়। ফিরে আসার কোন পথ নেই। কেউ কখনো আসেনি।

কবিদের মন নরম হয়। নিশ্চয়ই ওর মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছে গাড়ির ধাক্কা খাওয়া একটা রক্তাক্ত দেহ। যে আমার বন্ধু।

গাড়িটা চলে গেছে দৃষ্টির আড়ালে। আনিস আসে- করে জিজ্ঞেস করল, 'আপনার সাথে কতদিনের পরিচয় ?'

আমি বললাম, 'স্কুলে আমার সাথে পড়ত। সবসময় একই বেঞ্চে বসতাম। আমার সবচেয়ে কাছের মানুষ ছিল।'

আনিস আরকিছু না বলে মাথা নিচু করল। হঠাৎ করেই আমার মনে পড়ল, আনিস সবসময় ঢাকাই প্রচলিত ভাষায় কথা বলে। চেষ্টা করে একেবারে নিখুত উচ্চারনের। মাঝেমাঝে ভুল করে যেন সুদ্ধ ভাষা ব্যবহার করে। এই মুহূর্তে যে প্রশ্ন করল তাতে কোন আঞ্চলিক টান নেই। সত্যিকারের একজন কবি, একজন সাহিত্যিক এই ভাষা, এই উচ্চারনে কথা বলে।

ও কি ভাবছে আমি জানি না। চেষ্টা করেও ওরসাথে কথা বলতে পারছি না। আরকিছু বলার না পেয়ে বললাম, 'চলুন আমার সাথে। বাড়িতে কিছু বই আছে আপনাকে দেই। আমার বইপত্র রাখার যায়গা নেই।'

আনিস তাতেও কোন কথা বলল না।

রাস্তা পেরিয়ে একটা রিক্সা নিয়ে উঠলাম দুজন। প্রচন্ড ভিড়ের মধ্যে শম্ভুক গতিতে আমরা এগিয়ে চলছি। আনিস বসে রয়েছে মাথা নিচু করে। আশেপাশের কোনকিছু দেখছে না। আমার নিজেরই অস্বসি- লাগছে ওর এই পরিবর্তন দেখে। পুরো পথে তাকে দিয়ে কোন কথা বলাতে পারলাম না।

বাড়ি পৌছে আমি ঘর খুলে তালাচাবি বিছানায় রেখে বললাম, 'দুমিনিট বসুন। নয়ত বই বাছাই করুন। আমি আসছি।'

ঘর থেকে কোকের খালি বোতলটা নিয়ে বের হলাম। এটা আমি চায়ের ফ্লাস্ক হিসেবে ব্যবহার করি। দারোয়ানের ছেলেটাকে টাকা দিলে দোকান থেকে চা এনে দেয়।

ওকে কোথাও দেখলাম না। আশেপাশে কাউকেই পাওয়া গেল না। বাধ্য হয়ে নিজেকেই যেতে হল দোকানে। এক প্যাকেট চানাচুর, কয়টা বিস্কুট আর চা নিয়ে ফিরলাম। দেখলাম আনিস আমার চেয়ারে বসে রয়েছে।

আমি কাপ ধুয়ে চা ঢালার ব্যবস্থা করতে করতে জিজ্ঞেস করলাম, 'বই পছন্দ হল ?'

আনিস মাথা ঘুরিয়ে বইগুলোর দিকে তাকালো। বোঝা যাচ্ছে এতক্ষন বই দেখেনি। ওর সামনে একটা চায়ের কাপ রেখে চানাচুরের পিরিচটা বাড়িয়ে ধরলাম, 'চা-চানাচুর খেতে বেশ লাগে।'

আনিস কোন কথা না বলে আঙুলের মাথায় একটু চানাচুর তুলে মুখে দিল।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'কতদিন পর এখানে এলেন বলুন তো ?'

আনিস বলল, 'মনে নেই। অনেকদিন।'

আমি বুঝতে পারছি ও মনকে সি'র রাখতে পারছে না। মকবুলের কথা ভুলতে পারছে না। বারবার ঘুরেফিরে সেকথাই ভাবছে। ভাবছে কিভাবে গাড়ির ধাক্কায় একটা জীবন চলে গেল। হয়ত ভাবছে যেকোন সময় যেকেউ এই পরিনতির শিকার হতে পারে। মৃত্যুর বিষয় একবার যার মাথায় ঢোকে তখর আর তাকে বের করা যায় না। কে নাকি আত্মহত্যার বিভিন্ন উপায় নিয়ে বই লিখেছিল। পাঠক এত বেশি সংখ্যায় আত্মহত্যার চেষ্টা করতে শুরু করেছিল যে বইটাকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। চিরপরিচিত, চিরসত্য মৃত্যুকে মানুষ হঠাৎ করেই উপলব্ধি করে।

আমার মনে হল ওর বাড়িতে যাওয়াই উচিত। বউয়ের কাছে গেলে একথা ওকথায় এসব ভুলে যাবে। নিজেই সেলফ থেকে বই বাছাই করে ওর ব্যাগে তুলে দিলাম। তারপর বিছানা থেকে তালাটা হাতে নিয়ে বললাম, 'চলুন আপনাকে এগিয়ে দেই। আপনার বউ সারাদিন একা রয়েছে। আমাকেও একটু বাইরে যেতে হবে।'

আনিস কোন কথা না বলে উঠল। আমি চাবির খোঁজে তাকালাম চারিদিকে। ওটা টেবিলের ওপর। চাবি নিয়ে দরজায় তালা দিয়ে বাইরে এসে ওকে একটা রিক্সায় তুলে দিলাম।

বহুদিন থেকেই ঘুমানোর নিজস্ব নিয়ম তৈরী হয়ে গেছে আমার। রাতে বিছানায় শুয়ে নানারকম বিষয় নিয়ে ভাবতে থাকি। এই করলে ওই হত, অমুক হলে তমুক হত, এইসব। সারারাত চিন্তা করে নতুন নতুন বুদ্ধি বের করি। পরদিক সকালে উঠেই সমাজকে অন্যরকমভাবে দেখব পণ করে ফেলি। আমার যতটুকু করার আছে করব। একদিন না একদিন এর ফল ফলবেই।

এসব ভাবতে ভাবতেই একসময় চোখ বন্ধ হয়ে যায়। সকালে ঘড়ি দেখতে থাকি কখন বাইরে যাওয়ার সময় হয়। একেবারে মিনিট হিসেব করে বিছানা ছাড়ি। আর ছুটির দিন বিছানা ছাড়ি একেবারে দুপুরের খাবার সময় হিসেব করে। আর সকালে উঠের ভুলে যাই রাতের সবকিছু। পরদিন আবার নতুন করে শুরু করি।

আগে থেকেই ঠিক করে রাখলাম রাতের চিন্তার বিষয়। মকবুলের সাথে একটা বোঝাপরা করতে হবে। ও আসলে কি চায় জানতে হবে। এধরনের লুকোচুরি চলতে দেয়া যায় না। ওকে সরাসরি জিজ্ঞেস করব পিস-লের কথা।

আর আনিসের বিষয়টা। হাফিজের প্রকাশক বন্ধুর কথা বানিয়ে বলেছিলাম। কিন' হাফিজের ধরন আলাদা। চাইলে প্রধানমন্ত্রির সাথেও সে সম্পর্ক বের করে ফেলতে পারে। সে আনিসের বই ছাপার একটা ব্যবস্থা করে ফেলতে পারবে। কিন' তারও আগে আমাকে বিষয়টা মনেমনে ঝালাই করে নিতে হবে। দুজনেরই মনরক্ষা করে চলতে হবে। দুজনেই নিজেদের মানদন্ড ঠিক করে নিয়ে যেখান থেকে একচুলও সরবে না। তার সীমা কোথায় আমাকে ভেবে বের করতে হবে।

কিন' কিছুই হল না। রাতে বিছানায় শরীর রাখার সাথেসাথে কিছু বুঝে ওঠার আগেই কোথায় যেন হারিয়ে গেলাম।

চোখ খুলে দেখি সকাল। প্রতিদিন যেমন সকাল দেখি তেমনি সকাল। তখনই মনে পড়ল, আজ অফিস যেতে হবে না। অফিসের পুরো দল গেছে ঢাকার বাইরে। তারমানে আবারো ঘুমাতে হবে।

সেই চেষ্টাই করলাম। পণ করেছি দুপুরের আগে কিছুতেই উঠব না। দেখা যাক কতটা পারা যায়।

ঘন্টার পর ঘন্টা শুয়ে থাকলাম। একে কতটা ঘুম বলা যায় জানি না। তবে সময় কাটতে থাকল। একসময় দুপুরের আজানও শুনতে পেলাম। তারপরও শুয়েই থাকলাম। একসময় মনে হয় কোথায় যেন শব্দ হচ্ছে। কে যেন দরজায় শব্দ করছে। নিশ্চিত হয়ে উঠে দরজা খুলে দেখি রাফি।

‘কি ব্যাপার! এই সময় ?’

‘ঘুমাইতেছিলেন ?’

‘আর কি করব ? বস, আমি মুখে পানি দিয়ে আসি।’

মুখ মুছতে মুছতে ফিরে এসে দেখি রাফি টেবিলের সামনে চেয়ারে বসে। জিজ্ঞেস করলাম, ‘চলছে কেমন ?’

রাফি হেসে মাথা নিচু করল, ‘এই আরকি। চলতাছে। বাজার দর।’

‘বাজারদর বাড়তি না কমতি ?’

‘কেউ কয় বাড়তি কেউ কয় কমতি। বুঝতাছি না।’

রাফিও দার্শনিক হয়ে যাচ্ছে তাহলে। রইল বাকি এক। আমি জিজ্ঞেস করলাম, ‘ক্লাশ নেই আজ ? কিসের ছুটি ?’

রাফি বলল, ‘ছুটি না, ছুটি না। ক্লাশ আছিল। সবদিন কি ক্লাশ করতে ভাল লাগে কন ? মাঝেমধ্যে ভার্সিটি ফাঁকি দেই। সবাই ফাঁকি দেয়।’

আমাকে একটু অবাকই হতে হল। নিজেও ছাত্র ছিলাম, এভাবে ঘোষনা দিয়ে ভার্সিটি ফাঁকি দেয়া যায় জানা ছিল না। জিজ্ঞেস করলাম, ‘ভার্সিটি থেকে কিছু বলে না ?’

রাফি বলে, ‘কি কইব ? এতগুলান ট্যাকা দেয়। ট্যাকা না পাইলে ভার্সিটি চলব ?’

আমাকে সায় দিতে হল। সম্মতি দিয়ে বললাম, 'ঠিকই। দুধ দেয়া গরুকে কি কিছু বলা যায়। বের করে দিলে টাকাগুলো মার যায়। তা তোমাদের সমস্যা হয় না ক্লাশ না করলে ? পড়তে তো হয়। তার ব্যবস্থা কি ?'

রাফি বলল, 'একটা ব্যবস্থা হয়। আপনে খালি অন্যরকম কথা কন। এই বয়সে কি ক্লাশে বইয়া থাকতে ভাল লাগে ? জীবনে তাইলে রইল কি ?'

আমি তারচেয়ে বয়স্ক। প্রথামত তাকে উপদেশ দেওয়া আমার অধিকার। আমি বললাম, 'একটু ধৈর্য্য ধরলে হয় না। এই কয়টা বছর কষ্ট করে তারপর নাহয় জীবন উপভোগের ব্যবস্থা কর। অন্তত একটা ভাল যায়গায় দাঁড়াও।'

রাফি কিছু না বলে মাথা নিচু করে থাকল। আমার মনে হল বিষয়টা সে নিজেও ভেবেছে। এখন এরচেয়ে বেশি বললে হয়ত বিগড়ে যাবে। আমি অন্যভাবে এগোতে চেষ্টা করলাম, 'আচ্ছা রাফি, নিয়মটা একটু পাল্টালে কেমন হয় বলত। এই ধর যারা তোমাদের বয়সি তাদের পড়াশোনা করতে হয়। অথচ মন চায় কিছু টাকা আয় করতে আর বাকি সময় সেই টাকা খরচ করতে। আর যারা চাকরী করে তাদের মুখে সবসময় আফসোস, আহা যদি আগে বুঝতাম কত ভালভাবেই না পড়ালেখা করতাম। এই নিয়মটা পাল্টালে কেমন হয়। যারা অল্প বয়সি তারা চাকরি করবে, ব্যবসা করবে। তারপর যখন বয়স বাড়বে তখন স্কুলে, কলেজে, ভার্সিটিতে এসে ভর্তি হবে।'

রাফি তাকিয়ে থাকল অবাক হয়ে। তারপর প্রশ্ন করল, 'বুড়া বয়সে পড়াশোনা কইরা লাভ কি ? চাকরী দিব ক্যাডা ?'

আমি হেসে বললাম, 'একেবারে বাস-ব কথা বলেছ। চাকরীর চিন্তা না থাকলে আর পড়াশোনা দরকার কি ? তুমি দেখি বিশেষজ্ঞ হয়ে যাচ্ছ দিনদিন।'

রাফি উত্তরে হাসল। আমার দৃষ্টি গেল ওর সাজপোষাক আর চুলের দিকে। বললাম, 'তোমার এই পোষাক আর চুল কোন দেশের আমদানী বলত ? হলিউডের সিনেমায় তো এসব দেখা যায় না।'

রাফি বলল, 'পোষাক-জুতা বিদেশী মাগার দিল হ্যায় হিন্দুস্থানী। সরি, বাংলাদেশী।'

আমি মুখে হাসি ধরে রেখে সরলভাবেই বললাম, 'চুলগুলো অন্তত ছোট কর। আজকাল সবাই মেরিন সেনার মত চুল কাটে। চারিদিকে ফাঁকা মাথার ওপর ঘাস। তোমারটা একেবারে মেয়েদের মত হয়ে গেছে।'

রাফি বলল, 'হইলে সমস্যা কি ? মেয়েরা চুল রাখে ছেলেদের মত। পোষাক পড়ে ছেলেদের মত। তাইলে আমি লম্বা চুল রাখতে সমস্যা কোথায় ?'

আমি বললাম, 'ছেলে আর মেয়েতে আর তফাৎ নেই তেমন, কি বল ? পোষাক-আষাক, চুলের ষ্টাইল, গহনাপাতি, চালচলন সবদিক দিয়েই। সমানাধিকারটা তাহলে এদিক থেকেই চালু হচ্ছে।'

রাফি বলল, 'অহনো বাকি আছে। আমি শাড়ি পড়া পোলা দেহি নাই। দাঁড়িআলা মাইয়াও দেহি নাই।'

ওর সহজ সরল বক্তব্য শুনে আমি না হেসে পারলাম না। হাসতে হাসতে জিজ্ঞেস করলাম, 'তা সেটা কবে দেখা যাবে ?'

রাফি চিনি-তভাবে বলল, 'কইতে পারি না। দাঁড়িডাতো অরিজিনাল। এইডা ক্যামনে সেট করব বুজতাছি না।'

আমি বললাম, 'আজকাল সবই হয়। তুমি বেশি খোঁজখবর রাখ না। ডাক্তাররা করতে পারে না এমন কাজ নেই।'

রাফি বলল, 'ঠিকই। অন্যদেশে শুরু হইলে তবে না এদেশে আইব। তৈয়ার করার চাইতে ইমপোর্ট করা সহজ।'

রাফি কথাটা কোন অর্থে বলল বুঝলাম না। মিল কারখানার কথা বলছে না-তো। পাটকল, চিনিকল, কাগজের কল এসব বন্ধ করে বাইরে থেকে আমদানীর কথা বলে কেউ কেউ। ধানচালও নাকি ইন্ডিয়া-থাইল্যান্ড থেকে আনলে খরচ কম পড়ে। রাফির দিকে তাকিয়ে বোঝার চেষ্টা করলাম। ও-ও কি এসব নিয়ে মাথা ঘামায় নাকি ?

রাফি বলল, 'পড়ালেখা শেষ কইরা কি করমু ভাবতাছি ? আর বেশিদিন ছাত্র পরিচয়ে থাকা যাইব না।'

জিজ্ঞেস করলাম, 'আর কতদিন ?'

রাফি বলল, 'চার মাস।

জিজ্ঞেস করলাম, 'কি করবে ঠিক করেছ কিছু ? মানে, কোন লাইনে যাবে ?'

রাফি চিন্তা করল কিছুক্ষন। মাথা চুলকাল। তারপর বলল, 'কিছু করতে ট্যাকা লাগে। ট্যাকা পামু কই ?'

গলায় সহানুভুতি এনে জিজ্ঞেস করলাম, 'কত টাকা ? টাকা পেলে কি করবে ?'

রাফি সম্ভবত ভরসা পেল না আমার কথায়। বলল, 'অনেক ট্যাকা।'

বুঝলাম তার প্রয়োজন মেটানো আমার সাধ্যের বাইরে। তারপরও জিজ্ঞেস না করে পারলাম না, 'কাজটা কি ?'

রাফি বলল, 'মানে, চিন্তা করছিলাম চায়না থিকা কিছু আনা যায় কি-না। আজকালতো এইডাই সবচেয়ে লাভের ব্যবসা।'

এ সত্য আমিও জানি। আকবরও এই ধান্দায় আছে। হাফিজ থাকলে বরং যেটুকু জানিনা সেটুকু জানার চেষ্টা করতাম। এর কাছে সেকথা পেড়ে লাভ নেই।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'অন্যরা কি করছে ? তোমার সাথে অন্য যারা পড়াশোনা করে। তাদেরও তো কিছু করতে হবে।'

রাফি বলল, 'সবাই, সবাই। একজনে বায়িং হাউজ চালু করছে। একজন ঠিক করছে ওষুধ কারখানা দিব। তার বাপের অনেক ট্যাকা। আমারে কইছে চাকরী দিব।'

আমি কিছুটা ঝুঁকি নিয়ে বললাম, 'আচ্ছা রাফি, সবাই যদি চায়না থেকে জিনিষ আনার ব্যবসা করে, গার্মেন্টস ব্যবসা করে, ওষুধ বিক্রি করে তাহলে দেশ চালাবে কে ?'

রাফি চমকে উঠল, 'তার মানে ?'

আমি বললাম, 'দেশ চালাতে তো মানুষ লাগে। যেমন ধর যাকে বলে প্রশাসন, সেটা চালাতে শিক্ষিত লোক লাগে, আমলা লাগে, নেতাও লাগে। সেসব আসবে কোথা থেকে ? নাকি এসব আমদানি করবে চায়না থেকে ?'

রাফি কিছুক্ষন হা করে তাকিয়ে থাকল। মনে হল বোঝার চেষ্টা করতে সেখানে ফ্যাক্টরীতে এসব তৈরী হয় কিনা। আমি আরো নির্দিষ্ট করে জিজ্ঞেস করলাম, 'এসব হতে চায় না কেউ ? তোমার সাথে যারা পড়ালেখা করে।'

রাফি বলল, 'আমরা তো ওসব পড়ি না। ব্যবসা পড়ি।'

জিজ্ঞেস করলাম, 'কি পড়ায় ?'

রাফি মনে করতে চেষ্টা করল। যেভাবে মনে পড়ল সেভাবেই বলতে চেষ্টা করল, 'এই মানে, কনজুমার বিহাবিয়ার, তারপর ষ্টাটিসটিকস ইন বিজনেস এইসব আরকি। আরো কি কি জানি সব নাম। সব বিদেশি বই। দেইখা কাইলকা জানামুনে-'

আমি তাড়াতাড়ি তাকে থামালাম, 'না-না, দরকার নেই। এমনি বলছিলাম আরকি। দেশ চালাতে আমলা লাগে তো।'

'আমলা কারে কয় ?'

এবার আমি থতমত খেলাম। রাফির কাছে এমন প্রশ্ন আশা করিনি একেবারেই। কোনমতে বলতে চেষ্টা করলাম, 'এই মানে যারা দেশ চালায় আরকি-'

রাফি বলল, 'আমি শুনছি আমলা ভাল জিনিষ না। সবাই কয় আমলাতান্ত্রিক জটিলতা। জটিল জিনিষ না থাকাই ভাল।'

কি উত্তর দেব খুঁজে পেলাম না। সবসময় মনেমনে প্রিপারেশন নিয়ে রাখি কোন অবস্থায় কি ব্যাখ্যা দেব। কি করলে সকল সমস্যার সমাধান হবে মুহূর্তে বাতলে দেব। আর এখন প্রয়োজনের মুহূর্তে কিছুই মাথায় আসছে না। আসলেই তো। যখন পাগলা ষাড়ে তাড়া করে তখন আবহাওয়ার খবর নিয়ে কাজ কি ? একটা জ্ঞানই তখন প্রয়োজন। খিচে দৌড় মারা। রাফির প্রয়োজন টাকা কামানো। সেখানে এতকিছু নিয়ে মাথা ঘামানোর সময় কোথায় ?

আমি কাজের কথায় গেলাম। জিজ্ঞেস করলাম, 'যাচ্ছিলে কোথায় ? নাকি এখানে আসার জন্যই বের হয়েছ ?'

রাফি বলল, 'শাহবাগ যাওয়ার জন্য রিক্সায় উঠছিলাম। একটা গাড়ি ধাক্কা মাইরা দিল চাকাডা ভচকাইয়া। তখন ভাবলাম দেখি আপনে আছেন নাকি ?'

আমার সাথেসাথে মকবুলের কথা মনে পড়ল। বললাম, 'রাস্তাঘাটে সাবধানে চলবে। আমার এক বন্ধু মারা গেছে গাড়ির ধাক্কায়।'

রাফির মুখ হা হয়ে গেল। আপনাথেকেই সেখান থেকে বের হল, 'তারপর ?'

'তারপর আর কি ? সে গেল কবরে আর গাড়ির মালিক দিব্বি গাড়ি চালিয়ে বেড়াচ্ছে ?'

রাফি উত্তেজিতভাবে বলল, 'কেউ কিছু কয় নাই। সাথেসাথে এই গাড়িতে আগুন দেয়া দরকার ছিল।'

আমি হেসে বললাম, 'আমি তোমাকে গাড়ির নাম্বার জানাচ্ছি। পারলে দিও। এখন বল, তোমার হাতের অবস্থা কি ? শাহবাগ যাওয়ার ভাড়া আছে ?'

রাফি আমতা আমতা করে বলল, 'যাওয়ার ভাড়া আছে, কিন'।'

আমার বুঝতে বাকি থাকল না। একটু বিপাকেই পরলাম। পকেটে খুচরা টাকা যা আছে সেটা দেয়া যায় না। নিজেরই মান যায়। আর আছে পাচশ টাকার নোট। সেটাও একে দেয়ার ইচ্ছে নেই। অকারনে খরচ করে ফেলবে। সম্ভবত কারো সাথে আড্ডা মারতে যাচ্ছে। তারমানে টাকাগুলো যাবে চা-সিঙ্গারার দোকানে।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'সময় আছে, না এখনই দৌড় দিতে হবে ?'

রাফি আগের ভঙ্গিতে বলল, 'তেমন তাড়া নাই।'

আমি গায়ে জামা চড়িয়ে বাইরে বেরলাম। আজকাল পাচশ টাকার নোট ভাঙাতে কোন সমস্যা হয় না। সহজেই চারখানা একশটা, দুখানা পঞ্চাশ টাকা বানিয়ে ফেললাম। মনে পড়ল কিছু খাওয়াও প্রয়োজন। একটা পঞ্চাশ টাকা আবার দোকানে দিয়ে পাউরুটি-কলা কিনে ঘরে ফিরলাম।

ঘরে ঢুকে দেখি রাফি দাঁড়িয়ে থেকে একটা বই খুলে দেখছে। ওর দিকে দুশ টাকা বাড়িয়ে ধরলাম, 'চলবে এতে ?'

রাফি বলল, 'ভাবতাছি ওদিকে আর যামু না।'

আমি বললাম, 'যাওয়ার মন করে বের হয়েছে, এখন মন পাল্টালো কিসে?'

'এমনি। ভাল লাগতাছে না। টাকা থাক।'

বলে আমাকে হতভম্ভ করে দিয়ে টাকা না নিয়েই সে বাইরে চলে গেল।

এমন অবাক সত্যিই কখনো হইনি। আমি কোন ব্যাখ্যা খুঁজে পেলাম না রাফির আচরনের। কিছু একটা ঘটেছে। কিছু একটা পরিবর্তন হয়েছে কোথাও। এক মুহূর্তের পরিবর্তনে নাকি মানুষ বিপরীতধর্মী হয়ে যায়। কুখ্যাত ডাকাত হয়ে যান আউলিয়া। অত্যাচারি রাজা হয়ে যান সেরা ণৃপতি। রাফির মধ্যে হয়ত তেমন কিছু হয়েছে। সত্যিসত্যি ভাবতে শুরু করেছে তার কাজের কিছু করা উচিত। এভাবে অনর্থক টাকা আর সময় নষ্ট করা ঠিক হচ্ছে না।

নিজের ওপরই খুশি হয়ে উঠলাম এধরনের পরিবর্তনে ভুমিকা রাখতে পেরে। হঠাৎ করেই যেন খিদে বেড়ে গেল। খেয়ে দেয়ে আবারো বিছানা।

আরেক আজান পর্যন্ত কাটালাম বিছানায়। আরপর উঠে জামাকাপড় গায়ে চড়িয়ে বেরলাম। বাড়ির গেট পার হওয়ার সুযোগও পাইনি, থামতে হল। সোলেমান। সোজাসুজি জানতে চাইল, 'আপনের জানা বিদেশে যাওয়ার লোক আছে ?'

আমি ভাবলাম পরিচিত কেউ বিদেশে যাবে কিনা জানতে চাইছে। নিশ্চয়ই তারহাতে কিছু পাঠাবে। কিন' বিদেশ বিষয়টা কি এতই ছোট যে কেউ একজন গেলেই তাকে দিয়ে কাজ হবে!

আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'কেন ?'

সোলেমান বলল, 'ঠিক করছি বিদেশ যামু। এইখানে ভাল কিছুর আশা নাই। অপরিচিত লোকরে ট্যাকা দিয়া ভরসা পাই না।'

এতক্ষনে বুঝলাম সে আসলে বিদেশে লোক পাঠায় এমন লোকের খোঁজ করছে।

না, আমার পরিচিত তেমন কেউ নেই। দুচারজনকে চিনি যারা বিদেশে পাঠানোর পরামর্শ দেয়, ভাষা শিখায়, কাগজপত্র ঠিক করে দেয়। ভালই কামায়। কিন' বিদেশে পাঠাতে পারে বলে আমার বিশ্বাস হয় না। সে ক্ষমতা থাকলে নিজেই সকলের আগে দৌড় দিত।

কিন' এ একথা জানতে চাইছে কেন ?

জিজ্ঞেস করলাম, 'কি করবে বিদেশে ?'

সোলেমান বলল, 'যে কোন কিছু। বাইরে ভাল লোকের কদর আছে। আইটির লোক খুইজা পায় না। একজন গ্যাছে ইটালি। যেখানে যায় সেইখানেই চান্স পায়। পাচ হাজার ইউরো বেতন। খালি ওয়ার্ক পারমিট নাই দেইখা ঢুকতে পারতাছে না।'

আমি আরেকবার তাকে দেখলাম ভাল করে। আইটির লোকের চাহিদা রয়েছে সেটা আমিও শুনেছি। কিন' এ তার কি করবে ? সেই অভাব পুরন করবে? তার সম্পর্কে আমি যতদুর জানি, যতটুকু দেখেছি, সে বাড়িঅলার কিছু একটা হয়। সকাল-বিকেল সন্ধ্যেয় তিন ধরনের পোষাক পরে এদিক ওদিক ঘুরে বেড়ায়। মুলত চায়ের দোকানের আসেপাশে। কখনো শুনেছি পড়াশোনা করে, কখনো শুনেছি চাকরী করে। যদিও সারাদিনই তাকে দেখতে পাওয়া যায় এলাকায়।

আমার যেচেই উপদেশ দিতে ইচ্ছে হল। বললাম, 'শুনেছি ওরা যেধরনের মানুষ চায় তাতে অনেককিছু জানতে হয়। অনেক সময় লাগে ওগুলো শিখতে।'

'সকলের মাথা একরকম না।' সোলেমান একফুঁয়ে থামিয়ে দিল আমাকে।

আমি বিরক্ত হলাম। তারপরও, আমার তাকে ছেড়ে দিতে ইচ্ছে হল না। এর বয়স কম, অভিজ্ঞতা কম। মনে হল, দেখি, যদি কিছুটা গতি কমানো যায়। রাফি কথা শুনেছে, এও শুনতে পারে। শুনেছি অনেকে বহু টাকাপয়সা খরচ করে এভাবে যেয়ে বিপদে পরে। মারাও পরে। নয়ত জেল খাটে। দেশের জন্যও সেটা দুর্নামের ব্যাপার। আমার হাতে সুযোগ রয়েছে অন্তত একজনকে সেপথ থেকে ফেরানোর।

সোলেমান নিজে থেকেই বলল, 'কোর্স করতাছি। তিনমাসের কোর্স ছয় হাজার টাকা।'

আমি তার আত্মবিশ্বাসে চিড় ধরানোর চেষ্টা করলাম, 'তোমাকে যিনি শেখাচ্ছেন তিনি যদি তিনমাস শেষ হওয়ার আগেই চলে যান ? এসব কাজে খুব চাহিদা যখন। সুযোগ পেলে তিনি কি খুব দেরী করবেন ? তিনিও নিশ্চয়ই সুযোগের অপেক্ষায় আছেন ?'

তাকে একটু ভাবিত মনে হল। মনে হল এটা একটা বিশ্বাসযোগ্য যুক্তি। অথবা অন্য কোন কারন। বেশীক্ষন অপেক্ষা করতে হল না অবশ্য কারনটা জানার জন্য।

'ও যেতে পারবে না। ওতো কিছুই জানে না।'

এবার আমার ভাবিত হওয়ার পালা। যার কাছে শিখছে সে নিজেই কিছু জানে না। তাহলে ? তার কাছে শিখে সে কি হবে ?

আমি তাকে সরাসরি বোঝানোর চেষ্টাই করলাম। বলতে শুরু করলাম, 'দেখ সোলেমান-'

সোলেমান বাধা দিয়ে বলল, 'সালমান।'

কথায় বাধা দেয়া আমার একেবারেই অপছন্দ। এভাবে বাধা দেয়ায় আমার সদিচ্ছা একেবারেই চলে গেল। আমার ইচ্ছে হল তাকেই একটু বাজিয়ে দেখি না কেন।

কারো ক্ষতি করতে চাইলে নাকি তারসাথে হাসিমুখে কথা বলতে হয়। আমি সে চেষ্টা করে বললাম, 'আরো অনেক পেশাই তো রয়েছে যেখানে বহু টাকা আয় করা যায়। যেমন ধর দাঁতের ডাক্তার। একটা দাঁত তুলতে ক'মিনিট সময়ই বা লাগে, অথচ কত টাকা! আমি টাকার ভয়ে সাহস পাচ্ছি না যেতে।'

সোলেমান (সালমান) এমনভাবে তাকাল যেন দোটানায় পরল। আমি কারন বোঝার চেষ্টা করলাম। প্রস্তাবটা কি তার কাছে বেশী লোভনীয় মনে হচ্ছে ? অথবা যার কাছে কোর্স করছে এখন আর তার ওপর নির্ভর করে ভরসা পাচ্ছে না ? লোহা গরম থাকতে ঘা মারতে হয়। আমি আশ্বাস দিলাম, 'এটা বেশ সহজ কাজ। একটা সাঁড়াসি হলেই চলে। তোমার গায়ে যথেষ্ঠ শক্তি রয়েছে, খুব দ্রুতই তুলে ফেলতে পারবেন। এত দ্রুত যে সে টেরই পাবে না। পটাপট।'

সে কতটা ভরসা পেল বোঝার চেষ্টা করলাম। ঠিক বোঝা গেল না। আরো বোঝানোর চেষ্টা করলাম, 'মানুষ গবেষনা করে বের করেছে দাঁতের রোগ পৃথিবীতে সবচেয়ে সাধারন রোগ। পৃথিবীর সব দেশে, সব সমাজে, সব বয়সের মানুষের এর শিকার হতে হয়। বুঝতে পারছ না, পৃথিবীর সাতশকোটি লোক, সবাইকে যেতে হয় দাঁতের ডাক্তারের কাছে। শুধু এখানে না, সব দেশে। মরুতে, মেরুতে সব যায়গায়।'

এবারে তার একটু টনক নড়ল মনে হল। টনক বস্তুটি কোথায় থাকে জানি না। যেখানেই হোক সে সেটা নাড়ানোর জন্য ঘাড় নেড়ে আমার দিকে তাকাল। জানতে চাইল, 'ইউরোপে ?'

'আরে সেখানেই তো সবচেয়ে বেশী।' আমি রীতিমত উৎসাহ দেখালাম, 'অন্য কেউ হলে গলাধাক্কা দিয়ে বের করে দেয়, আর ডাক্তার হলে ডেকে নেয়। রীতিমত টানাটানি করে, দাঁত ধরে টানার মত। ওদেরই বেশী বেশী করে রোগ হয় কিনা। মন্ত্রী, নেতা, আমলা ওদের। সব দেশেই।'

'তাহলে একটা বায়োডাটা লিখে দিন।'

সরাসরি কাজের পথেই গেল সে। আমাকে রীতিমত হতচকিত করে। এখন পাশ কাটাই কিভাবে ? বললাম, 'আগে একটু দেখে টেখে নিলে হয় না ? কিভাবে ঠিক দাঁত ধরতে হয়। যদি পরীক্ষা করে দেখতে চায়।'

'তখন শিখে নেব।'

এ যে একেবারে নাছোড়বান্দা। এক্ষুনি বোধহয় রওনা দেবে। আমিও লাগসই যুক্তি পেয়ে গেলাম তখনই। বললাম, 'এখন তো হাতে লেখা দরখাসে- কাজ হয় না, কম্পিউটারে করে দিতে হয়। আমি কম্পিউটার পাব কোথায় ? ওই যে মোড়ে দোকান আছে, ফোন, মোবাইল, ফটোকপি, ফ্যাক্স, কম্পিউটার- ওদের বললে করে দিতে পারবে। সবসময়ই করে। বলবে ভাল দেখে দাঁতের ছবি বসিয়ে দিতে। রঙিন ছবি, বড় করে। সহজে চোখে পরবে, তখন মনোযোগ দিয়ে দেখবে। ওদের কাছে অনেক দরখাস- যায় তো, সব দেখার সময় পায় না। ছবি দিয়ে বুঝিয়ে দিতে হবে। আর অনেকে লেখাপড়াও জানে না। কারো কারো চোখের সমস্যাও থাকে, ছোট লেখা পড়তে পারেনা। যদি বড় ছবি থাকে তাহলে ছবি দেখেই ডাকবে।'

বলেই মনে হল তার আগ্রহ আবার চোখের ডাক্তারীর দিকে না যায়। দেখলাম সে দাঁত নিয়েই সন'ষ্ট। আরেকবার ঘাড় নাড়িয়ে চলে গেল। আমি রওনা দিলাম চায়ের দোকানের দিকে।

কিন' বিপদ যখন আসে তখন একের পর এক আসতেই থাকে। চায়ের দোকানে পৌছাতে আরেকজনের সাথে দেখা।

'স্লামালেকুম ভাইজান। এইমাত্র আপনার কথা মনে করলাম। দেখলেন কিভাবে আপনার হায়াত বাড়িয়ে দিলাম। এই উপলক্ষে কিছু খাওয়ান।'

আমার মেজাজ এতটাই বিগড়ে গেল যে কোন কথা না বলে কোনদিকে না তাকিয়ে দোকান ছাড়িয়ে সোজা এগিয়ে গেলাম।

অকারনে পথে হেঁটে বেড়ালাম অনেকক্ষন। শেষে একটা চায়ের দোকানে থামলাম। ঢাকা শহরে এমন চায়ের দোকানের অভাব নেই। হাজার হাজার। কিংবা লক্ষ লক্ষ। ইচ্ছে করলেই থেমে কিছুটা সময় কাটানো যায়। এককাপ চা খেতে খেতে চারিদিকে তাকালাম।

আমার একেবারে কাছে ট্রাফিক পুলিশের সাদা মোটরসাইকেল দাঁড় করানো। তার পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে কর্তব্যরত একজন। একজন মোটরসাইকেল আরোহীকে থামিয়েছে। একেবারে সকলের চোখের সামনে। আমি তাদের সম্পর্কে অনেক গল্প শুনেছি, কি হয় সেটা নিজের চোখে দেখতে পাব ভেবে কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। আমাকে নিতান্ত গোবেচারা ভেবেই হয়ত পুলিশটি কিছু মনে করল না। আমি তাদের কথোপকথন শুনতে লাগলাম।

'একটা কেস ঠুকে দেই?'

'কেন ? লাইসেন্স কি ভুয়া মনে হচ্ছে ?'

'না।' রীতিমত হাসিখুশি পুলিশের মুখ।

'হেলমেট কি ঠিক নেই ?'

'ঠিক আছে।'

'সিগন্যাল অমান্য করেছি ?'

'না।'

'তাহলে ?'

'আপনার নাম্বার পড়া যায় না।'

'একটু ধুলো পরেছে। তাও পড়া যায়।'

'ওটা বাঁকা হয়ে আছে।'

'আপনি সোজা হয়ে দাঁড়ান, দেখবেন নাম্বারপ্লেট সোজাই আছে। এখন যেতে পারি ?'

'না।'

'কেস করবেন ?'

'হ্যাঁ।'

'কি লিখবেন ?'

'কর্তব্যে বাধা দেয়া। পুলিশের সাথে তর্ক করা।'

আমি আর দেরি করলাম না। চায়ের বিল দিয়ে আবার পথে নামলাম।

আজকের দিনটা একেবারে যাচ্ছেতাই। তারচেয়ে বরং দেখি হাফিজ স্বরেআ মন্ডলের দেখা পাওয়া যায় কিনা।

হাফিজকে একাই পেলাম বাড়িতে। এন্টিডুরিং বিদায় নিয়েছে। মনে হল সে আমার জন্যই অপেক্ষা করছিল। ঘরে ঢুকতেই মোবাইল ফোনের মত একটা জিনিষ এগিয়ে দিল। সাথে কানে লাগানোর জিনিষ।

মুখে বলল, 'লন। এফএম রেডিও। বিবিসি শুনতে পাইবেন। দেশি রেডিও শুনতে পাইবেন। গানবাজনা শুনতে পাইবেন। বাংলা-ইংরাজি-হিন্দি সব। দিনরাত চব্বিশ ঘন্টা।'

আমি সেটা হাতে নিয়ে অবাক হলাম। বেশ সুন্দর দেখতে। জিজ্ঞেস করলাম, 'অনেক দাম নিশ্চয়ই।'

হাফিজ বলল, 'চল্লিশ টাকা। চাইনিজ মাল। এই চার্জারডা লন। একচার্জে দুই=আড়াই ঘন্টা চলব। তারপর আবার চার্জ দিতে হইব।'

আমি রীতিমত খুশী হয়ে উঠলাম। হাফিজ প্রায়ই উদাহরন দেয় অমুক যায়গায় তমুক হয়েছে। ইদানিং আনিসও কথায় কথায় বলে টিভিতে অমুক দেখলাম। এখন আমারও একটা হিল্লে হল।

সেটা দেখে নিয়ে পকেটে ঢুকাতে ঢুকাতে বললাম, 'পকেট উচু হয়ে থাকলে আবার মোবাইল মনে করে ছিনতাইকারী ধরবে নাতো ?'

হাফিজ বলল, 'ধরলে অবস্থা বুইঝা ব্যবস্থা নিবেন। অস্ত্র থাকলে যা আছে দিয়া দিবেন। আর সুযোগ পাইলে রদ্দা মারবেন। আপনে শুরু করবেন, পাবলিকে শেষ করব।'

জিজ্ঞেস না করে পারলাম না, 'এমন অবস্থায় আপনি কি করেন ?'

হাফিজ বলল, 'অহনো সামনে পরে নাই।'

ছিনতাইকারীও তাহলে মানুষ চেনে। চিনবে না-ই বা কেন। নিজের পেশার খবর নিজেকেই রাখতে হয়।

জিজ্ঞেস করলাম, 'ঘরেই বসে থাকবেন না হাঁটাহাটি করবেন। চলুন বের হই।'

হাফিজ বলল, 'চলেন। আর কয়দিন হাঁটা যাইব ঠিক নাই। কয়দিন হাইটা লই।'

'কেন, হাঁটার ওপর আবার কর বসাচ্ছে কে ?'

হাফিজ বলল, 'যার বসানোর সেই। সরকার সাহেব। আইন করতাছে ফুটপাত ছাইড়া রাস্তায় নামলে দুইশ টাকা জরিমানা। আচ্ছা কনতো, এক ফুটপাত কয়জনরে বিক্রী করব। দোকানদারগো ইজারা দিছে, বেকার সমস্যার সমাধান করছে, ময়লা ফেলার যায়গা বানাইছে, গাড়ি রাখার যায়গা বানাইছে, আবার মানুষরে হাটতেও কয়।'

আমি বললাম, 'কর্তাব্যক্তিদের চলাফেরা করতে নিশ্চয়ই অসুবিধে হয়। সামনে মানুষ পরলে গতি কমাতে হয়। নয়ত চাপা দিতে হয়। ও আপনাকে বলা হয়নি। সেই যে গাড়িটা, আপনি বললেন শয়তানের নম্বর, সেটা আমার এক বন্ধুকে চাপা দিয়ে মেরেছে।'

হাফিজ একবার তাকিয়ে দেখল আমার দিকে। আসে- করে বলল, 'কইছিলাম ওইডা শয়তানের নম্বর।'

হাফিজ আর কথা বাড়াল না। একেবারে মুখ বন্ধ করে দরজায় তালা দিয়ে পথে বের হলাম দুজন। আমার হঠাৎ করে আনিসের কথা মনে হল। তাকেও মকবুলের ঘটনা বলার সাথেসাথে তার মন খারাপ হয়েছিল। এরপর তারসাথে আর দেখা হয়নি। হাফিজও কথাটা শোনার সাথেসাথে কথা বন্ধ করেছে। হাফিজের এই স্বভাব আমি জানি। যখন কথা বলবে তখন তার বক্তব্য না বোঝা পর্যন্ত কথা চালিয়ে যাবে। আর যদি কথা বন্ধ করে তারমত স্বল্পবাক আরেকজন খুঁজে পাওয়া যাবে না।।

আমরা বাইরে বেরিয়ে হাঁটতে হাঁটতে একটা চায়ের দোকানের সামনে দাঁড়ালাম। একনজর দেখেই আমার মনে হল দোকানীও স্বল্পবাক। এবং সাথে সাথে-

যারা অপ্রয়োজনে কথা বলেন না বা অল্প কথা বলেন তারা স্বল্পবাক, যারা অপ্রয়োজনে দেখেন না তাদের কি বলে তবে ?

এধরনের কোন শব্দ কোথাও দেখেছি বলে মনে করতে পারলাম না। আমার ভাষাজ্ঞান দুর্বল, অন্যভাবে ঘুরিয়েই সেটা বলার চেষ্টা করি। এই দোকানীর দেখার আগ্রহও কম। অন্তত আমাদেরকে। আমরা দাঁড়িয়েছি তার দোকানের ঠিক সামনে। অন্য কেউ নেই। তাকে দেখলাম ডানদিকে তাকিয়ে থাকতে। অনেকক্ষন তাকিয়ে থাকল সেদিকে। আমি অপেক্ষা করছি কখন সে তাকাবে আমাদের দিকে। তখন চা বানাতে বলব। একসময় দেখলাম সে মাথা ঘুরাচ্ছে। এখনই তাকাবে। আর একটু। তার ধীরগতিতে মাথা ঘুরানো হঠাৎ করেই লাফ মারল। আমাদের টপকিয়ে বামদিকে চলে গেল। এখন সেদিকে তাকিয়ে আছে। সেদিকেই থাকল সেটা অনেকক্ষন। আবার মাথা ঘুরাতে শুরু করল। আবার ডানদিকে। আমাদের টপকিয়ে।

আমার আরেকদিনের অভিজ্ঞতার কথা মনে হল।

গেছি পোষ্ট অফিসে। ছোট পোষ্ট অফিস। ভেতরে একজনকেই দেখলাম। বয়স চল্লিশ পেরিয়েছে কোন সন্দেহ নেই। ঝাড়া ছ'ফুট লম্বা। পড়নে কেতাদুরস- সার্টপ্যান্ট, চুল ব্যাকব্রাশ করা, থুতনিতে নক্সাকাটা দাঁড়ি। প্রথমে বেমানান মনে হল। যেন ভুল করে এখানে এসে পরেছেন।

দেখলাম তিনি চেয়ারে বসে কিছু একটা লিখছেন মনোযোগ দিয়ে। আমি সোজা সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। একেবারে দুহাত দুরে। তিনি লিখেই চললেন। হয়তো বাড়িতে চিঠি লিখছেন। চোখের সামনে হলেও আমি পড়ার চেষ্টা করলাম না। অপেক্ষা করলাম তার কাজ শেষ করার। তিনি লিখেই চললেন। কতক্ষন লাগল জানিনা, একসময় লেখা শেষ হল। তিনি সেটা ভাঁজ করলেন। আবার খুললেন। পড়লেন। আবার ভাঁজ করলেন। আবার ভাঁজ খুললেন। আবার পড়লেন। একযায়গায় বানান সংশোধন করলেন। আবার ভাজ করলেন। ড্রয়ার টেনে খাম বের করলেন। সেখানে ঢুকালেন। আবার বের করলেন। খামে ঠিকানা লিখলেন। আবার ঢুকালেন। চেয়ার থেকে উঠলেন। পানি ঢেলে খেলেন। আবার এসে বসলেন। আবার চিঠি বের করলেন। আবার একলাইন লিখলেন। আবার পড়লেন। আবার খামে রাখলেন। চোখ বন্ধ করে চেয়ারে হেলান দিলেন। আবার সোজা হলেন। আবার চিঠি হাতে নিলেন। উঠলেন। হেঁটে গেলেন। আঠার শিশি হাতে নিলেন। ফিরলেন। চেয়ারে বসলেন। আবার চিঠি হাতে নিলেন। আবার খুললেন। আবার-

আমি হাফিজের দিকে তাকালাম। সে কি যেন ভাবছে। মনেহয় মকবুলের কথা। আমি একাএকাই দেখতে থাকলাম দোকানীকে। দেখলাম সে একে একে সবদিকেই তাকাচ্ছে। ডানদিকে, বামদিকে, ওপরদিকে, নিচদিকে, দোকানের জিনিষের দিকে, রাস্তার লোকের দিকে, আমার দিকে একবারও তাকায়নি।

তার এই আচরণের হেতু আমার বোধগম্য হল না। সে এখানে বসে রয়েছে খদ্দেরের আশায়। নিশ্চয়ই অন্যের কাছে আক্ষেপ করে এই কষ্টকর কাজের। এখন তার সামনে দুজন জলজ্যান্ত খদ্দের অথচ তার ভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে আমরা এসে কোন অপরাধ করেছি। আমি নিশ্চিত এখান থেকে চলে গেলে সে গালাগালি করবে। মনেমনে অথবা প্রকাশ্যে। তার সাধ্যমত।

অবশেষে হাফিজ এদিকে দৃষ্টি দিল। তার গলার স্বর শোনার সাথেসাথে দোকানী কার্টুন ছবির মত দ্রুতগতিতে চা বানাতে লেগে গেল। চা তৈরীর পর কাপ হাতে একটু দুরে দাঁড়িয়ে আমি নিচু গলায় তাকে তার আচরনের কথা জানালাম।

'এইডাই স্বাভাবিক।' একেবারে নির্লিপ্ত গলায় জানাল হাফিজ।

আমি কি বলব ভেবে পেলাম না। হঠাৎ করেই যেন আলাপের সব বিষয় উধাও হয়ে গেছে। আমি জোর করে নতুন কথা পাড়ার চেষ্টা করলাম। তাকে শুনিয়ে বললাম, 'সবাই বলে বাংলাদেশের মানুষ খুব সচেতন।'

হাফিজ নির্লিপ্তভাবে বলল, 'কম হইলে ভাল ছিল।'

আমি অবাক হয়ে বললাম, 'সেটা আবার কেমন কথা! মানুষ যদি সচেতন না হয় তাহলে গনতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হবে কিভাবে ? লোকে বলে গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিক রূপ, সেটা হবে কিভাবে ?'

'লোকে কয়।' হাফিজ বলল, 'লোকে কয় আমেরিকার মানুষের যদি পকেটে টাকা থাকে তাইলে দেশের প্রেসিডেন্ট কে সেইডা নিয়াও মাথা ঘামায় না। আমার মনেহয় সেইডাই ঠিক। নিজের কাম কর, খাওদাও, ফুর্তি কর। নিজে ঠিক থাক, পরিবার ঠিক রাখ। তারপর পারলে প্রতিবেসিদের সাথে মিল রাইখা চল। কোন নেতা কি করল তাতে আমার কি। এইগুলান যখন ঠিক থাকে না তখনই নেতা নিয়া মাথা ঘামাইতে হয়। নেতারাও সেইডাই চায়। কারখানা বন্ধ কইরা মাঠে নামেন, শ্লোগান দ্যান, গাড়ি ভাঙেন, এরপর পকেটে কিছু টাকা নিয়া বাড়ি যান।'

এর উত্তর দেয়া আমার সাধ্যাতীত। আবারও নতুন কথা খুঁজতে শুরু করলাম। অনেক খুঁজে আনিসের কথা মনে করতে পারলাম। তাকে বললাম, 'আনিসকে একজন প্রকাশক ডেকেছিল।'

বলে ঘটনার বর্ননা দিলাম। হাফিজ পুরোটা শোনার পরও কোন মন্তব্য করল না। আমাকেই যেচে জিজ্ঞেস করতে হল, 'আপনার পরিচিত লোকজন তো অনেক। বই ছাপার মত কেউ নেই ?'

হাফিজ বলল, 'বাইর করা সম্ভব। কিন' কবি কি সেইডা পছন্দ করব। কবি অর্থ চায় না, চায় স্বীকৃতি। লোকজন সেইডা দিতেই পছন্দ করে। একসময় দ্যাখবেন অমুক কবি কত কষ্ট করছে, কত প্রকাশকের কাছে ঘুরছে এইসব কেচ্ছা কাহিনী লিখব। এমন অবস্থায় না পরলে কেউ বড় হয় না। যারা বড় হইছে তাদের কথা পইড়া দ্যাখেন, এইডাই চিরন্তন সত্য। এমন ঘটনা না থাকলে বড়মাপের মানুষ মানায় না।'

এই আলাপেও সুবিধে হল না। শান্তনা যা পেলাম তা হচ্ছে হাফিজকে বিষয়টা জানানো গেছে। ওরজন্য এটুকুই যথেষ্ট।

চা শেষ করে নিত্যদিনের মত হেঁটে বেড়াতে শুরু করলাম। একঘন্টা-দুইঘন্টা, কতঘন্টা ঘুরলাম মনে নেই। একসময় হাফিজকে জিজ্ঞেস করলাম, 'এখান থেকে কার বাড়ি কাছে বলুন তো ? আমার না আপনার ?'

হাফিজ বলল, 'আপনে মনে করবেন আপনের বাড়ি কাছে, আমার মনে হয় আমার বাড়ি কাছে।'

'ভৌগলিক দুরত্ব বলুন। আমার মনে হচ্ছে আমার বাড়ি কাছে।'

হাফিজ বলল, 'আমিও তো তাই কইছি।'

আমি আর কথা না বাড়িয়ে সরাসরি বললাম, 'তাহলে সেখানেই চলুন। রাতের খাওয়াদাওয়া করে নিজের বাড়ির দিকে রওনা দেবেন। শুধুশুধু দুজন আলাদা খাবার ব্যবস্থা করার প্রয়োজন কি।'

হাফিজ আপত্তি করল না। হাঁটতে হাঁটতে ঠিক করে ফেললাম খাবার আয়োজন কি আছে, কি কিনতে হবে। বাড়ির কাছে এসে হাফিজকে বললাম, 'এই চাবিটা নিয়ে ঘর খুলে বসুন, দুএকটা জিনিষ কিনতে হবে। আটটা বাজলেই দোকান বন্ধ।'

হাফিজ বলল, 'মহল্লার দোকান খোলা থাকার কথা।'

আমি বললাম, 'সব বন্ধ করতে হয়। সেদিন দেখলাম দোকানদার তার ছেলের বয়সি একজনের পায়ে ধরে মাফ চাইছে দেরি হয়েছে বলে। দেরি করলে লাইন কেটে দেয়।'

হাফিজ হাসতে হাসতে বলল, 'দিছে কখনও ?'

আমাকে আমতা আমতা করে বলতে হল, 'তা-তো দেখিনি।'

হাফিজ বলল, 'আপনের সেই বয়স্ক ব্যক্তির এত সহজে পরিবর্তন হইব না। সে লক্ষন থাকলে অন্যের পা ধরার আগে নিজের সন্মান রক্ষার ব্যবস্থা করত।'

আমি নতুন বিতর্কে না গিয়ে তাড়াতাড়ি বললাম, 'যাকগে, ঝুঁকি নিয়ে কাজ কি। আপনি বসুন আমি এখনি আসছি।'

জোর করে হাফিজকে ঘরের দিকে পাঠালাম। আমার বাড়িতে অতিথি হয়ে এসে দোকানে টাকা শেয়ার করবে এটা হতে দেয়া যায় না।

অফিসে আজকাল আকবরের দেখা কমই পাওয়া যায়। আমার প্রাক্তন ঘর সবসময় পর্দার আড়ালে থাকে আর আমিও ঘরে ঢুকে যতটা সম্ভব নিজের ঘরকে আড়াল করে রাখি। যে স্বাধিনতা হাতে পেয়েছি সেটা কারোসাথে ভাগাভাগি করার ইচ্ছে আমার নেই। ইদানিং কাজের দিকে আগ্রহও বেড়ে গেছে। হিসেব করে দেখে এক সপ্তাহে যা কাজ করেছি তা আগে এক মাসেও করতাম না।

অন্যান্য দিনের মত একমনে কাজ করছিলাম। চোখ তুলতেই দেখি সামনে আকবর। পর্দা একদিকে ঠেলে ধরে দাঁড়িয়ে।

তাকে অভ্যর্থনা জানালাম, 'আরে আসুন আসুন। আপনাকে দেখাই যায় না আজকাল। একেবারে কাজপাগল হয়ে পড়লেন যে।'

আকবর কোনমতে এসে সামনের চেয়ারে বসল। ওর ভাবগতিক আমার খুব সুবিধের মনে হল না। ওর চেয়ারে আমি বসে, আর এতদিন আমি যেখানে বসতাম সেখানে সে। আবার পাল্টাপাল্টি করবে না-তো।

রীতিমত সহানুভুতি দেখিয়ে বললাম, 'চেয়ার ছেড়ে নড়েনই না একেবারে। এত কাজ করলে তো স্বাস্থ্য খারাপ হবে। খাওয়াদাওয়া চলছে ঠিকমত ?'

আকবর সংক্ষেপে বলল, 'হ।'

হাসি বজায় রেখে জিজ্ঞেস করলাম, 'তারপর বলুন, খবর টবর কি ?'

আকবর সাথেসাথে কথা বলল না। বেশ কিছুক্ষন বসে থাকল চুপ করে। আমাকে উঠে গিয়ে বসিরকে চায়ের কথা বলে আসতে হল। ফিরে এসে দেখি সে একইভাবে বসে।

জিজ্ঞেস করলাম, 'ব্যাপার ট্যাপার কি বলুন তো। কোন সমস্যা ?'

আকবর উদাসভাবে বলল, 'সমস্যা আর কি। সমস্যা নিয়াই তো জীবন। যতদিন বাঁচবেন সমস্যা ছুটব না।'

আকবরও তাহলে দার্শনিক হয়ে যাচ্ছে। তাহলে বাকি থাকল কে ?

জিজ্ঞেস করলাম, 'নতুন করে আবার কি সমস্যা দেখলেন ? আপনি তো সমস্যা সমাধানে, সেই যাকে বলে সিদ্ধহস-। আপনাকে কাবু করতে পারে এমন সমস্যা তো নেই। আপনার আবার সমস্যা কি ?'

আকবর বলল, 'আর কইয়েন না। খরচের কি শেষ আছে। এত্তটুক পোলাপানের পড়ালেখায় যে এত খরচ কে জানত ? আরে আমরাও তো পড়ালেখা করছি। ইসকুলে বেতন দিছি দুই কি তিন টাকা। আর বই খাতা। ব্যাস হিসাব শেষ। অহন অমুক বিষয়ের টিচার, তমুক বিষয়ের শিক্ষক, সমুক বিষয়ে কোচিং, ঢমুক বিষয়ে গাইড। তারওপর ইসকুল থিকা কি কি সব লিখতে দেয়। টাকা দিয়া ইন্টারনেট থিকা ডাউনলোড কর, টাকা দিয়া অনুবাদ করাও, টাকা দিয়া প্রিন্ট করাও তারপর জমা দাও। খালি টাকা আর টাকা। এইডা কিসের পরীক্ষা কন তো ?'

আমি হাসতে হাসতে বললাম, 'কেন, কার বাপের কত টাকা আছে তার পরীক্ষা। দেখবেন কদিন পর ছাত্রের বদলে বাপের নামে সার্টিফিকেট দেবে।'

আকবর বলল, 'অহনই দিতাছে। কইছে এই বুড়া বয়সে বার্থ সার্টিফিকেট লইতে হইব। সেইডা দিয়া প্রমান করতে হইব আমার জন্ম হইছে। না লইলে কি করব কন তো ? দ্যাশ থিকা বাইর কইরা দিব ? দিলে আমি খুব খুশি হই। বহু চেষ্টা কইরাও দেশের বাইরে যাইতে পারি নাই।'

আমি সাথেসাথে বাধা দিলাম, 'সেকি, আপনি দেশের বাইরে যাবেন কেন ? আপনার মত মানুষ দেশ ছেড়ে গেলে দেশ চলবে কি করে ? এমনিতেই কাজের মানুষ পাওয়া দুস্কর।'

আকবর বিরক্ত হল, 'আপনে খালি শক্ত শক্ত কথা কন। আচ্ছা, জেন্ডার সার্টিফিকেট কি কনতো ?'

আমি অবাক হলাম, 'এটা আবার কোথায় পেলেন ?'

আকবর বলল, ‘একজনে কইল। কয়দিন পর এইডাও নাকি লাগব।’

তাকে আস্বস- করে বললাম, ‘ঘাবড়াবেন না। একটু এদিক ওদিক করে কদিন কাটাবেন দেখবেন বাজেট শেষ হলেই সব ভুলে গেছে। তখন শুধু ডেথ সার্টিফিকেট থাকলেই চলবে।’

আকবর জিজ্ঞেস করল, ‘সেইডা কে দ্যায় ?’

আমি একথার উত্তর দেয়া প্রয়োজন মনে করলাম না। নিজে যখন ডেথ সার্টিফিকেটের মালিক নই।

আকবর বলল, ‘আচ্ছা শোনেন, আপনের কাছে আইলাম একটু বুদ্ধি পরামর্শের জন্য। আপনে তো বিনা ফিতে বুদ্ধি দেন। ভাবতাছি, চাকরি তো অনেক করলাম, এইবার একটু ব্যবসার লাইনডা দেখি।’

আমি উৎসাহ দিলাম, ‘হ্যাঁ, হ্যাঁ। আপনি একদিন বললেন সুগন্ধি কলম না কিসের যেন ফ্যাক্টরী-’

আকবর হাত নেড়ে থামিয়ে দিল আমাকে, ‘আরে ধ্যাত, কলম। লেখাপড়ার দিন আছে নাকি। ফ্যাক্টরীর অনেক ঝামেলা। অমুকে কাজে ফাঁকি দিব, তমুকে চুরি করব। আজ হরতাল, কাল ধর্মঘট, তারপর অবরোধ। তারচেয়ে চায়না থিকা জিনিষ আইনা বিক্রি করা ভাল। শুনছি যে কোন জিনিষের নাম কইলে তারা বানাইয়া দেয়। যে যা যায়, যে দামে চায়। রিভার্স ইঞ্জিনিয়ারিং আর কষ্ট ইঞ্জিনিয়ারিং। দুইডা একলগে।’

আকবরের মুখে একেবারে লেটেষ্ট শব্দ শোনার আশা করিনি। আমি আগ্রহ না দেখিয়ে পারলাম না। আগ্রহ নিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, ‘নতুন কোন আইডিয়া এসেছে না-কি ? প্রোডাক্ট ঠিক করেছেন ? কি আনবেন ?’

আকবর আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল কিছুক্ষন। তার মনোভাব বুঝতে আমার সময় লাগল না। তাড়াতাড়ি বললাম, ‘না-না, এসব ব্যবসায় অনেক টাকা লাগে। আমার টাকাও নেই, আগ্রহও নেই।’

আকবর বলল, ‘আপনাকে খুবই বিশ্বাস করি। শোনেন একটা আইডিয়া।’

বশির চা দিয়ে যাওয়ায় আকবর থামল। তারপর চলে যাওয়ার পর চায়ে চুমুক দিয়ে সাগ্রহে শুরু করল, ‘আজকাল লোডসেডিংএর যা ঝামেলা। ঠিক করছি নতুন ধরনের বাত্তি আনমু। এই ধরেন, লোডসেডিং হইলেও একঘন্টা জ্বলব। পারব না বানায়া দিতে ?’

আমি সোৎসাহে বললাম, ‘হ্যাঁ-হ্যাঁ, পারবে না কেন ? ওরা পারেনা এমন কাজ নেই। সারা পৃথিবী ওদের ভয় পায়। দ্যাখেন না, আজ আমেরিকায় তৈরী হয় তো কাল চায়না। ফিফটি পার্সেন্ট দামে বিক্রি করে। কিন'- একটা সমস্যা। আপনি আনার সাথে সাথে যদি অন্যরাও আনতে শুরু করে ? দেখতে দেখতে ফুটপাতে বিক্রি শুরু হয়ে যাবে। শুনেছি ওরা কোন নিয়ম টিয়ম মানে না। যে কিনতে যায় তার কাছেই বিক্রি করে।’

আকবর বলল, ‘অ।’

বলে ভাবতে শুরু করল। পুরো চা শেষ করা পর্যন্ত ভাবল। তারপর কাপটা রেখে বলল, ‘একবারে বেশি কইরা আনলে হয় না! অন্যরা আনার আগে ব্যবসা শেষ। তারপর নতুন আরেকটা।’

আমি বললাম, 'এটা খুব ভাল বুদ্ধি। ওয়ান টাইম ব্যবসা। আপনি শুরু করলেন। তারপর আরেকজন করার আগেই ব্যবসা শেষ। মাঝখানে আপনি কোটিপতি।'

আকবর তৃপ্তির হাসি হাসল। আমি অবাক হলাম না। তার কোটিপতি হওয়ার শখ আমার ভালমতই জানা।

আকবর বলল, 'তাইলে কইতাছেন আগাইতে পারি। আর কোন সমস্যা নাই ? ভাল কইরা চিন্তা ভাবনা কইরা কন। কেউ তো ভাল কথা কইতে চায় না। খালি কাঁচি মারার তালে থাকে।'

আমি আরো কিছুক্ষন চিন্তা করলাম। তারপর বললাম, 'লাইট অফ করবেন কিভাবে ?'

'মানে ?'

'মানে।' আমি বললাম, 'লোড সেডিং হলে যদি বাতি জ্বলতেই থাকে একঘন্টা, তাহলে সুইচ অফ করলেও তো একঘন্টা জ্বলবে। ঘুমাবেন কিভাবে ?'

আকবর বিরক্ত হল একথা শুনে। বলল, 'ক্যান, সেই ব্যবস্থা করা যায় না ?'

আমি আরো চিন্তা করতে থাকলাম আর আকবর অধীরভাবে আগ্রহ নিয়ে তাকিয়ে থাকল। শেষে বলতে হল, 'মাথায় আসছে না।'

আকবর বলল, 'আইচ্ছা থাক। ওই চিন্তা অন্য লোকের। কেনার সময় এত চিন্তা করব না। লোড সেডিংএ জ্বলব শুইনাই ষ্টক শেষ কইরা দিব। তারপর আমার কি ?'

আমার চিন্তা গেল না। আকবরও সেটা বুঝতে ভূল করল না।

সে জিজ্ঞেস করল, 'তাইলে আপনের বুদ্ধি যা কয় তাই কন। একটা আইডিয়া বাইর করেন। আপনেও সাথে থাকবেন, অসুবিধা নাই। পার্টনার ছাড়া একা কাম করা যায় না।'

আমি আমার চিন্তাঘর ঝেড়েমুছে যা পেলাম সেটাই জানাবার সিদ্ধান্ত নিলাম। বড় পরিকল্পনা। একবারে বললে ভড়কে যেতে পারে। ধীরেসুসে' শুরু করলাম, 'আজকাল লোডসেডিংএর চেয়ে ট্রাফিক জ্যাম বড় সমস্যা, তা জানেন। লোড সেডিং হলে নাহয় চোখকান বুজে থাকা যায়, রাস্তায় আটকা পরলে কিছু করার থাকে না। অফিসে দেরী হলে বসের গালাগালি, বাড়িতে দেরী হলে বউয়ের। দুদিক থেকে ঝড় চলে।'

আমি কি বলতে চাইছি না বুঝে আকবর চেয়ে থাকল অবাক হয়ে। জিজ্ঞেস করলাম, 'আজকাল রাস্তায় মোটরসাইকেল কত বেড়েছে দেখেছেন। সিনেমার হিরোর মত পিছনে হিরোইন নিয়ে ঘোরে।'

আকবর সায় দিল, 'হ, দেখছি।'

বুঝতে পারছি আকবর আমার বক্তব্য ধরতে পারছে না। আমি মুল কথায় গেলাম, 'এখানে বড় একটা সুযোগ আছে। একঢিলে দুই পাখি। ফুটপাতের ব্যবসায়ী এখানে হাত দিতে সাহস পাবে না।'

আকবর অবাক হয়ে তাকিয়ে অপেক্ষা করল। আমিও তার আগ্রহ বাড়াতে সময় দিলাম। আকবর আরেকটু সামনে এগিয়ে বসল।

'বুদ্ধিডা কি কন ?'

'এই ধরুন।' আমি কিভাবে বলব গোছাতে শুরু করলাম, 'এই ধরুন, চায়নাকে বলে যদি নতুন ধরনের মোটর সাইকেল তৈরী করা যায়। হেলিকপ্টারের মত পাখা থাকবে। যেখানে

দরকার সেখানে মোটর সাইকেল, যেখানে দরকার সেখানে হেলিকপ্টার। ট্রাফিক জ্যাম দেখলেই ভুরুত করে আকাশে উঠে যাবেন।'

আকবর হা হয়ে গেল। কোনমতে বলল, 'এইডা কি সম্ভব ?'

আমি বললাম, 'কেন, সম্ভব না কেন ? মানুষ কতকিছু করছে, এটা তো সামান্য। একবার বলেই দেখুন না। ইন্টারনেটে ঢুকে জিজ্ঞেস করে দেখুন। দেখবেন আবার যাকেতাকে আইডিয়াটা দিয়ে দেবেন না। তাহলে আপনাকে আর কেউ চিনবেই না। তাহলে আপনার আগেই বিএমডাবলু, জাগুয়ার এইসব গাড়ির ডিলাররা তাদের গাড়িতে পাখা লাগিয়ে আনবে। মাঝখান থেকে আপনি ফক্কা।'

আকবর বলল, 'আচ্ছা তাইলে আরেক কথা কন। মানুষ যদি এমনে চলতে শুরু করে তাইলে তো শুণ্যে একসিডেন্ট হইব। সেইডা থামাইব কেডা। ট্রাফিক পুলিশ দাড়াইব ক্যামনে ?'

আমি বিরক্তি দেখিয়ে বললাম, 'আর ট্রাফিক পুলিশ। এরা থাকলেই কি না থাকলেই কি। সেদিন পুলিশের সামনে আমাকে ধাক্কা দিতে যাচ্ছিল। আমার এক বন্ধুকে তো মেরেই ফেলেছে।'

হঠাৎ করেই আকবরের চেহারা পাল্টে গেল, 'আহা-রে। ক্যামনে?'

আমি বললাম মকবুলের কথা।

আকবর বলল, 'মানুষ যে কি হইছে-কত জানি কইলেন নম্বরডা ?'

আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনি গাড়ির নম্বর দিয়ে কি করবেন ?'

আকবর বলল, 'এইসব মানুষরে চিন্যা রাখা দরকার। একদিন আপনের বন্ধুরে মারছে আরেকদিন যে আমারে মারব না তার ঠিক কি? আপনারে একটা সত্যি কথা কই। এমন মানুষের হাতে মরার আগে মাইরা ফালান ভাল।'

আমি একেবারে হতভম্ভ হয়ে গেলাম। আকবরের মুখে এই কথা। ওর মুখে ঠাট্টা আর মোলায়েম কথাই মানায়। অন্যকে খোঁচা মারা ওর অভ্যেস। কিন' তাই বলে-

আকবর কোন কথা না বলে গম্ভীরভাবে বসে থাকল। তারপর উঠে বলল, 'আচ্ছা যাই। মনডা খারাপ লাগতাছে।'

আসে- আসে- হেঁটে আকবর ঘরের বাইরে চলে গেল।

বিকেলে হাফিজকে বাড়িতে পেলাম না। ঘরে তালা ঝুলছে। ঘরে না থাকলে ওর পাত্তা পাওয়া অসম্ভব। হতাস হয়ে আবার রাস্তায় নামলাম। এইসময় ঘরে যাওয়ার কোন অর্থ হয় না।

রাস্তায় হাঁটা আমার অভ্যেস হয়ে গেছে। মানুষ টিভিতে সাজানো নাটক দেখে, আমি সরাসরি নাটক দেখি। এমন নাটক লেখার যোগ্যতা কোন নাট্যকারের নেই। এমন অভিনয় ক্ষমতা কোন অভিনয় শিল্পীর নেই। নিখুঁত, নির্ভেজাল অভিনয়। ইচ্ছে করলে নিজেও অংশ নেয়া যায় নাটকে। নিজেই একটা চরিত্র বনে যাওয়া যায়। সমস্যা একটাই, ছোট হচ্ছে পৃথিবী। আজকাল পথে হাঁটতে ধাক্কাগুতো খেতে হয়। এই নাটক দীর্ঘক্ষন চালানো যায় না। আমাকেও হার মানতে হল। খুঁজে খুঁজে একটু ফাঁকা যায়গা বের করলাম। এখনো এমন দুচারটা যায়গা আছে যেখানে দোকান বসেনি কিংবা গাড়ি পার্ক করার মত ব্যবস্থা নেই। রীতিমত ঘিরে রাখা। কিছু গাছপালা। এমনকি কিছু বসার যায়গা। দাঁড়িয়ে সামনের দিকে তাকালাম।

আমার সামনে একজন ফেরিঅলা। দুহাতে দুটি চটের বড় ব্যাগ। এই ব্যাগে করে জিনিষ নিয়ে ফুটপাথের দোকানগুলিতে ঘুরে ঘুরে বিক্রি করে। শুনেছি এগুলি চকবাজার কিংবা অন্য পাইকারি বাজার থেকে পাইকারী দামে কেনে। দোকানে সাপ্লাই দিলে কিছু লাভ থাকে। দোকানীরও লাভ কারন তার যাতায়াত খরচ, সময় দুইই বেচে যায়। সময়ে বাকীও নেয়া যায়। এরা সকালে জিনিষ দিয়ে যায়, সন্ধায় বা রাতে টাকা নিয়ে যায়।

'ওরা কত লাভ করে ?'

প্রশ্নটি শুনে ঘুরে তাকালাম। মনেহল আমাকেই করেছেন কেউ প্রশ্নটি। প্রশ্নকর্তাকে দেখলাম। যুবকই বলা যায় একে। বয়স হতে পারে পঁচিশ, হতে পারে তিরিশ। এরবেশী হওয়া অস্বাভাবিক। পড়নে জিন্সের প্যান্ট, মোটা কাপড়ের শার্ট, পায়ে চামড়ার স্যান্ডেল, চুল উস্কোখুস্কো।

এ বর্ননা থেকে কেউ যদি ভেবে থাকেন তিনি ধনী পরিবারের সৌখিন সদস্য তাহলে আমি দুঃখিত। অনেকে জিন্সের প্যান্ট পরেন সেটা না ধুয়ে বহুদিন ব্যবহার করা যায় বলেই, মোটা কাপড়ের সার্ট ব্যবহারে করেন সেটা বহুদিন টেকে বলেই। যারা তালিমারা বা যায়গায় যায়গায় ছেড়া প্যান্ট পড়েন তারা আর যাই করুন অন্তত আর্থিক দৈন্যতায় ভুগছেন না সেটা দেখানোর ব্যবস্থাও রাখেন। এই যুবকের সেগুলি নেই। আর সবচেয়ে যা বড়, এর চোখ, এর দৃষ্টি। সেখানে প্রথমেই আমার যা চোখে পরল তা হচ্ছে একধরনের অসহায়ত্ব আর সারল্য। একেবারেই বোকা বোকা।

প্রশ্ন করে এখন আমার দিকে চেয়ে রয়েছে উত্তরের আসায়। আমি উত্তর না দিয়ে পারলাম না। একেই বোধহয় ভদ্র ভাষায় বলে ডিপ্লোম্যাটিক উত্তর।

'নিজের ব্যবসার কথা সাধারনত কেউ জানায় না।'

'দিনে এক দেড়শ আয় হয় ?'

'তা হয় নিশ্চয়ই।' বললাম আমি। তাকে বাস-বতার পথে আনার চেষ্টা করলাম, 'এদের কেউ চাকরী করে। কোম্পানী বেতন দেয়। কেউ নিজে কিনে বিক্রি করে। যারা কিনে বিক্রি করে তাদের লাভ বেশী।'

'তেমন লাভ থাকলে নিজেই শুরু করতাম।' বলল যুবকটি।

তার ইচ্ছের কথা শুনে অবাক হলাম আমি। আরো ভালভাবে লক্ষ্য করলাম তাকে।

এই যুবক করার মত কিছু খুঁজছে। অবশ্য তার পোষাক এবং ভাবভঙ্গি দেখে নিজে থেকেই সেটা মনে হওয়া স্বাভাবিক ছিল। অন্তত অবাক হওয়ার বিষয় না মোটেই। তবুও অবাকই

হলাম। অবাক হয়ে কারন খুঁজতে চেষ্টা করলাম। মনে হল, এই-ই তো স্বাভাবিক। সে যদি কোনদিকে লাভ দেখে সেদিকে যাবে। এটাই হতে দেখেছি সবসময়। অন্তত সামপ্রতিক দিনগুলিতে তো বটেই। ফুটপাতের এক দোকানী একবার আনিসের কাছে কাজ চেয়েছিল। সে কথা না বাড়িয়ে সরাসরি জানিয়েছিল সে লেখালেখির কাজ করে, সেকাজ কি করতে পারবে। দোকানি উত্তর দিয়েছিল, 'দেখিয়ে দিলেই পারব। এইট পর্যন্ত পড়ালেখা করেছি।'

এধরনের আত্মবিশ্বাস আমি বহুজনের মধ্যে দেখেছি। তারা যে কাজে হাত দেবেন সেটাই করতে পারবেন। যদি কেউ দেখিয়ে দেন একবার, কেউ ল্যাঙ না মারেন, এবং ভাগ্য সহায় থাকে। পত্রিকায় দেখেছি এম্বুলেন্সের ড্রাইভারও দেখে দেখে ডাক্তারি শিখে গেছে। কিভাবে রোগীর পেট কাটতে হয় জানে। অনেকেই ওস্তাদ ধরে ইঞ্জিনিয়ার হয়। কে যেন বিমান তৈরীর ঘোষনা দিয়েছে। পত্রিকায় ফলাও করে ছাপা হয়েছে।

'একজন ব্যাংকে পিয়নের চাকরীর কথা বলল, তা-ও বিশ হাজার টাকা ঘুষ দিতে হবে।' আমার চিন্তায় আবার বাধা দিল যুবকটি।

এখন সে বসে পরেছে সামনেই। তাকিয়ে আছে মাটির দিকে। যেন মাটিকেই শোনাচ্ছে কথা। আমার দিকে হয়ত তার লক্ষ্য নেই তেমন, একবার ভাবলাম। সেটা ভুল প্রমান করে হঠাৎ করেই তাকাল আমার দিকে। তাকিয়ে থাকল কিছুক্ষন। আমি যতটা সম্ভব চেহায়ায় সহানুভুতি ফুটিয়ে তুললাম।

সে বলল, 'একটা কাজ করি, বুঝলেন। মাসে সাতশ টাকা। তাও ঠিকমত দেয়না। বলে ধৈর্য্য ধর, কাজ কর। ধৈর্য্য ধরলে কি খিদে যায় বলেন। নিজের টাকায় যাওয়াআসা করি, নিজের টাকায় খাই, আর বলে ধৈর্য্য ধর।'

ঘুরে ফেরিঅলার পথের দিকে তাকাল একবার। সে ততক্ষনে দৃষ্টির বাইরে চলে গেছে। আবারো দৃষ্টি ফেরাল আমার দিকে।

আমার মনোযোগ ততক্ষনে পুরোপুরি চলে গেছে তার দিকে। অনেক সময়ই আমার মানুষ চিনতে ভুল হয়। সবসময়ই হয়। অন্তত এবারে হয়নি। এই যুবক কোন মতলব মনে রেখে কথা বলছে না। আমি নিশ্চিত সে তার সমস্যার কথা বলে আমার কাছে হাত পাতবে না। সে চাইছে কেউ তার কষ্টের কথা শুনুক। কি কারনে জানি না, আমাকে দেখে তার মনে হয়েছে আমার কাছে মনের কথা বলা যায়। আমি দেখলাম এর কথা একেবারেই সহজ সরল। কথা ঘুরিয়ে বলতে জানেনা। চোখের দৃষ্টি, অঙ্গভঙ্গি সবই তারসাথে মানানসই। আমার দিকে তাকিয়ে সরল হাসি হাসল সে।

'আমি মালয়েশিয়া ছিলাম ছয় বছর।' আবার শুরু করল সে, 'এখন আর কোথাও যেয়ে শানি- নেই। ভাল বেতন দেয় না। মিডল ইষ্টেও বেতন খুব কম। বাকি রাখে, কম দেয়। লোকজন বেতনের জন্য আন্দোলন করছে।'

সেখবরও আমি খবরের কাগজে পেয়েছি। অনেককে ফেরত পাঠানো হয়েছে তাও জানি। সত্যমিথ্যা জানি না, নিজের কিছু ধারনা তৈরী হয়েছে এবিষয়ে।

'এখন অনেক বেশি মানুষ যায়।' আমি বললাম, 'ওরা কম বেতনে লোক পায়। একজনকে যা বেতন দেয় আরেকজন এসে বলে আমি তারচে কমে কাজ করব। এজন্যই বেতন কমে গেছে।'

'হ্যাঁ।' কিছুক্ষন ভাবল যুবকটি। তারপর আপনমনেই যেন বলল, 'আবার সুযোগ পেলে চলে যাব।'

'মালয়েশিয়ায় বোধহয় লোক নিচ্ছে আবার। ওদের কাজ করার লোক কমে গেছে। কিছুদিন আগে বের করে দিল সবাইকে।'

'তখনই আমি চলে আসি।' জানাল সে, 'আগে জানলে আসতাম না।'

আমি যেন একটু একটু করে বুঝতে পারছি তাকে। আরো কয়েকজনকে দেখেছি যারা বিদেশে থেকে ফেরত এসেছে। এসে দুঃখ করছে। একেকজনের দুঃখের ধরন একেকরকম। এ বোধহয় কাজ না পাওয়ায় অর্থকষ্টে আছে। সেটা খুবই স্বাভাবিক। এদেশে বেকার কত কেউ জানেনা। এদেশ ইউরোপ আমেরিকা না যে বেকারের সংখ্যা বাড়লে তা নিয়ে লোকে হৈচৈ করবে। কত লোকের কর্মসংস্থান করা হয়েছে একথা বলে নেতারা বাহাদুরি নেবে। নেতাদের বাহাদুরি নেয়ার বিষয়ের অভাব নেই। এধরনের তুচ্ছ বিষয় নিয়ে মাথা না ঘামালেও তাদের দিব্বি চলে যায়।

'যার টাকা নেই তাকে কেউ চেনে না।' আবার শুরু করল যুবক। আমার দিকে তাকিয়ে বোধহয় প্রতিক্রিয়া বোঝার চেষ্টা করল, 'ছয় বছরে বারো-চৌদ্দ লাখ টাকা পাঠিয়েছি। কেবল খবর পাঠাতে যা দেরী, রাতে খবর পেলে সকালেই ফ্যাক্স করেছি। আর এখন- বুঝলেন, কেউ চেনেনা। সব নিজের লোক, নিজের ভাই। একটা সোনার চেন পাঠালাম, এত মোটা, আর এতবড় রুলি। সেটা কোথায় জিজ্ঞেস করতে রেগে গেল। মনেহয় বিক্রি করে জুয়াটুয়া খেলেছে। আমি তো টাকা ফেরত চাই না। আমি যে এত করলাম সেটা স্বীকার তো করবে। সেটা করলেও একটু শানি- পাই। তাও করেনা। বাড়ির মেয়ে যায় বাজার করতে, সেটা কি ভাল কথা বলুন। দেশগ্রাম হলে সারা গ্রামের মানুষ কথা বলত। এখানে ঢাকা শহরে নাহয় কেউ কারো খোঁজ রাখে না। তাই বলে এসব করতে হবে। বাড়ির মেয়েমানুষ বাইরে কোথায় যায় কেউ খোঁজ রাখেনা। বাড়িতে ছেলেমানুষ আছে। বললেই বাজার করে আনতে পারে। আমাকে বাজারে পাঠায় না, জানেন। দুচার টাকা বাঁচলে যদি চুরি করি সেই ভয়ে। একবার মুরগী কিনতে দিল দুশো টাকা। কিনে পঞ্চাশ টাকা বাঁচল। মাকে বললাম, মা পঞ্চাশ টাকা বেঁচেছে। মা বলল রেখে দে। আমি রেখে দিলাম। তখন থেকে আর বাজার করতে দেয় না। এসব কথা কি বলতে ভাল লাগে। আমার মা আমাকে এত ভালবাসে। আমার সামনে মাকে মারতে যায়। বলে বুড়িকে ধাক্কা মেরে ফেলে দে, ফেলে দে। মা আমাকে ছাড়া কারো সাথে থাকবে না। ওরা চায় আমি মাকে নিয়ে চলে যাই ওখান থেকে। আমি বাড়িতে থাকি না, জানেন। সকালে নটায় বের হই, রাতে দশটায় ঢুকি। সকালে যে দুঘন্টা বাড়িতে থাকি সেটাই সহ্য হয় না। জানেন আমি দুমাস ধরে দুপুরে বাড়ি যাই না। বাইরে কি খাই, না খাই। না খেয়ে থাকি।'

আমি স-ব্ধ হয়ে বসে থাকলাম মাথা নিচু করে। আমি সবচেয়ে বেশী যা এড়িয়ে চলি তা পারিবারিক কলহ। আমার ধারনা হয়েছে এটা এমন সমস্যা যার কোন সমাধান নেই। প্রতিদিন নিত্যনতুন সমস্যা যোগ হয় এতে, কোনটারই সমাধান হয় না। আমি কি উপদেশ দিতে পারি একে। এ-তো আমার কাছে এসব বলছে সহানুভুতি পাওয়ার আশায়।

আমার পক্ষে যা বলা সম্ভব তাই বললাম। বললাম, 'এসব বিষয় নিয়ে যত ভাববেন তত খারাপ লাগবে। বরং কি করা যায় এমন কিছু খুঁজে বের করুন। শুনেছি মালয়েশিয়ায় আবার লোক নিচ্ছে।'

'না, একেবারে বন্ধ।'

আমার জানার কথা না সেটা। তবুও, যেন খবরে শুনেছিলাম এধরনের কিছুএকটা, মালয়েশিয়ার কোন বড় নেতা যেন ঘুরে গেলেন কিছুদিন আগে, তার ওপর নির্ভর করে কথা চালিয়ে গেলাম।

'আবার লোক নেবে। ওদের সাথে চুক্তি হয়েছে। এখনও শুরু হয়েছে কিনা জানিনা, কিন' অনেক লোক পাঠানোর কথা। মনেহয় ম্যানপাওয়ার থেকে পাঠাবে।'

আমার চেয়ে তার অভিজ্ঞতা বেশী। সে তার অভিজ্ঞতার কথা শোনাল।

'একজন একবার দরখাস- দিতে বলল। বলল যারা আগে গেছে তারা আগে সুযোগ পাবে। ব্যাংক ড্রাফট জমা দিলাম। সব নিয়েটিয়ে বলল লোক নেবে না। দেখুন কত হাজার হাজার লোকের কাছ থেকে লক্ষ লক্ষ টাকা নিল তারপর সোজা না বলে দিল।'

একথার উত্তর আমার জানা নেই। সে সেই একজনের নাম বলেছে। সে নামও উল্লেখ করল। এতটাই গন্যমান্য ব্যক্তির নাম যে আমি সাথেসাথে কথা ঘুরালাম। বললাম, 'অন্যদিকে চেষ্টা করুন না। যার বাইরে থাকার অভিজ্ঞতা আছে সে আগে সুযোগ পাবে এটাই তো স্বাভাবিক।'

'হ্যাঁ। আমার এক ভাই সৌদি গেছে। শুনেছি একটা ভাল চাকরি পেয়েছে। দেখি ও কি করতে পারে। যাওয়ার আগে কম্পিউটার শিখেছিল। ওইযে শ্যামলীর কাছে কোথায় যেন, কি যেন নাম, সেখানে। কিন' ওখানে সব আরবী ভাষা। ওতো সেটা শেখেনি। টাইপ করতে দিয়েছিল ওকে। কয়েকদিন পর বলল তোমার ভুল হচ্ছে। একাজ তুমি পারবে না। তারচে অন্য কাজ কর। তারপর ওকে দোকানের কাজে দিয়েছে। মালিকটা ভাল। ভাল ব্যবহার করে। আমি ওর কাছে চলে যাব। আর আসব না।'

আমি বলার কিছু খুঁজে পেলাম না। মাথা নিচু করে বসে পা দিয়ে মাটিতে দাগ কাটতে লাগল যুবকটি। তারপর হঠাৎই উঠে দাড়াল।

'যাই, অনেক বকবক করলাম।'

সে হাঁটতে হাঁটতে চলে গেল।

আমার মনটা খারাপ হয়ে গেল। মকবুলের কথা মনে পড়ল। সেও মালয়েশিয়া গিয়েছিল। বাধ্য হয়ে ফেরত এসেছে। যখনই কেউ মালয়েশিয়া কি অন্য দেশে যেতে চেয়েছে সবসময় আমি আপত্তি জানিয়েছি। প্রকাশ্যে না হলেও মনেমনে গালি দিয়েছি। ব্যাটা গরু। অন্যদেশে গিয়ে মরুভুমিতে কাজ করবি, জঙ্গলে চাষ করবি, সাপের কামড় খাবি, একঘরে বিশত্রিশ জন ঘুমাবি। খেয়ে না খেয়ে শুধু কাজই করবি। এই পরিশ্রম নিজের দেশে করতে পারিশ না! করলে কত ভালভাবে থাকতে পারতি। পরিবারের সঙ্গ পেতি। লোকজনের সাথে নিজের ভাষায় কথা বলতে পেতি।

এই মুহূর্তে আমার সমস- ধারনা হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ল। কোন মুখে আমি এই যুবককে বলব এদেশে পরিশ্রম করতে, পরিবারের সাথে থাকতে, বসে গল্পগুজব করতে। কোন

পরিশ্রমের কাজ সে করবে ? সে কোথায় যেন কাজ করে-যেখানে তাকে মাসে সাতশ টাকা দেয়ার কথা। মাসে সাতশ টাকা, মানে প্রায় দশ ডলার। দিনে এক ডলারের তিনভাগের একভাগ। সেই বেতনও সে পায়না। বিশ হাজার টাকা ঘুষ দিয়ে ব্যাংকের পিয়ন। বেসরকারী ব্যাংকে পিয়নের বেতন কত ? কদিন পর তাকে সেখান থেকে গলাধাক্কা দিয়ে বের করে দেবে না সে নিশ্চয়তা কে দিচ্ছে ? তাহলে ? কি করতে বলব তাকে ? রিক্সা চালাতে ?

হ্যাঁ, যত পরিশ্রমের কাজই হোক একাজ সহজে পাওয়া যায়। একাজে নগদ আয়। আয়ও নেহাত মন্দ না। অন্তত মাসে সাতশ টাকা না মোটেই। দিনে দুশো-তিনশ, মাসে ছহাজার-নহাজার। কিন' তাই বলে কি একে রিক্সা চালাতে হবে ? এ নিশ্চয়ই কিছুটা লেখাপড়া জানে। সেসব জলাঞ্জলী দিয়ে পশুর মত শুধুই কায়িক শ্রম করতে হবে ? তার কিছু শিক্ষা আছে, কিছু জ্ঞান আছে, কিছু অভিজ্ঞতা আছে, বুদ্ধি আছে। অন্যদেশে কাজ করেছে মানে দায়িত্ব নিয়ে কাজ করতে জানে। কোন কারখানার শ্রমিক সে অনায়াসেই হতে পারে। সেটাই এরজন্য ভাল। সেটাই ঠিক।

কিন' সেই কারখানা কোথায় ? বিদ্যুৎ-গ্যাসের অভাবে কারখানা বন্ধ। গার্মেন্টসের লোকেরা মিছিল করছে, গাড়ি ভাঙছে, ফ্যাক্টরীতে আগুন দিচ্ছে।

আবারো মকবুলের কথা মনে হল। তার মতলব কিছু বুঝতে পারছি না। প্রথম দিনের পর আর একবারের জন্যও কথা বলেনি। কথা বললে উত্তর দেয়নি। সে আছে কিনা জানায়নি।

সমস- চিন্তা একসাথে এসে গালগোল পাকিয়ে দিল। আমি বাড়ির পথে হাঁটতে শুরু করলাম। বাড়ির সামনে এসেও বাড়িতে না ঢুকে এগিয়ে গেলাম সামনের দিকে। চায়ের দোকানে।

চায়ের দোকানে মানুষের অভাব কখনো হয় না। সবসময়ই ছোটখাট আসর বসে। বিকেল গড়িয়ে যত সন্ধ্যার দিকে যায়, রাতের দিকে যায় আসর তত বাড়তে থাকে। সময়ের সাথেসাথে আসরের অংশগ্রহনকারীদের বয়স পাল্টাতে থাকে। আজও দেখলাম এক যায়গায় রীতিমত আসর বসে গেছে। মাঝবয়সি একজন আসরের মধ্যমণি। সোজা হয়ে দাঁড়ালে ছয়ফুট ছাড়িয়ে যাবে। মুখভর্তি দাড়ি। মুল বক্তব্য আসছে তার কাছ থেকেই। তাকে ঘিরে রয়েছে কয়েকজন। একেবারে তার গা ঘেঁসে বসা একজন যুবক। বেশভুষা, চেহারা, আচার আচরন কোনকিছুই অন্যদের সাথে মানায় না। দামি একটা ক্যামেরা হাটুর ওপর রেখে ধরে আছে। কাঁধে ঝুলছে সেটার ঘর। হাসিহাসি মুখ করে আলোচনায় উৎসাহ দিচ্ছে।

তিনি বললেন, ‘হ, ঠাঠবাট না থাকলে চলব ক্যামনে। তাগো নামের পাশে একবার যদি পদবী যোগ হয় তাইলে আর ছাড়ে না। সাথে কইরা কবর পর্যন্ত যায়। ওইযে ইসরাইল, মুসলমানগো দুষমন, হ্যাগো একদিকে হামাস আরেকদিকে হিজবুল্লা, যুদ্ধ লাইগ্যাই রইছে, তারাও পয়সা দিয়া আর্মি রাখে না। যহন দরকার ডাইক্যা হাতে অস্ত্র তুইল্যা দেয়। আমাগো দ্যাশে, যদি ঠিক থাকে, তাইলে পুলিশ বিডিআরই যথেষ্ঠ। তারা তো সবসময় সরকারী পার্টি, হেইডাই সমস্যা।’

আলোচনার বিষয় বুঝতে সমস্যা হল না। রাস্তার ওপাশে একটা সুপারমার্কেটের সামনে থেমে থাকা জলপাইরঙের গাড়ি। থেমে রয়েছে পার্কিং নিষেধ লেখাটার ঠিক সামনে। গাড়িটার

দাম কত হতে পারে এই নিয়ে তর্ক শুরু হয়েছে। আমি চায়ের কাপ হাতে নিয়ে কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম।

পাশে বসা যুবক বলল, 'আপনি যে এভাবে কথা বলছেন কেউ শুনে ফেললে কি হবে জানেন ?'

তিনি এতে বিন্দুমাত্র গুরুত্ব না দিয়ে বললেন, 'ভয় পাইয়া কি কথা কওন যায়। ভয় জীবনে অনেক আছিল, বহুত হিসাবকিতাব কইরা কতা কইছি। অহন আর ভয় নাইক্যা। এই প্যালেও যা ওই প্যালেও তাই। যাকিছু কৈফিয়ত দেয়ার আল্লারেই দিমু। মানুষরে আর ডরাই না।'

পাশ থেকে আরেকজন বলল, 'ডরাই না কওয়া খুব সহজ। পাল্লায় পড়ছেন কোনদিন ?'

তিনি ধমকে বললেন, 'ওই ব্যাটা, তুই কয়বার পরছস ?'

সে ব্যক্তির অভিজ্ঞতা দেয়ার শখ মিটে গেল এক ধমকে। তিনি বললেন, 'একটা কথা শোনেন। আমি যদি অন্যায় না করি তাইলে অন্যরে ডরামু ক্যান। আমার এক দাদায় কইছিল তরা আইনের দেখছস কি। আমাদের সময় আছিল লাল সাহেব। উঠতে বসতে গালাগালি আর বুটের লাঠি। কি জোর রে বাবা। আমি কইলাম গরু চড়াইতে লাঠি লাগে। তোমরা আছিলা গরু। শুইন্যা আমার ওপর মহাখাপ্পা। মাইনষের সেই স্বভাবটা অহনো যায় নাই। আপনেরা শিক্ষিত মানুষ, বুদ্ধি খরচা কইরা চলবেন। ভাল কাজের উৎসাহ দিবেন, খারাপের দোষ ধরবেন। নিজে অন্যায় না করলে কাউরে ভয় পাইবেন না। তয় মনে কইরেন না আমারে ছয় টাকার খাওয়াইছেন দেইখ্যা এইসব কথা কইছি। আমি হগ্গলের দেয়া খাবার খাই না। বহুত বাছ বিচার করি।'

তার কথায় সায় দিয়েই যেন একজন গলা চড়াল, 'ওস্তাদ, আরেকটা চা খান।'

দেখলাম কাছের রিক্সা সারাই দোকানের কর্মচারী। টাল খাওয়া রিক্সার চাকা ঠিক করছে। তিনি হাত নেড়ে না করলেন। ওতরফ থেকে আবারো অনুরোধ এল, 'তাইলে একটা পানই খান।'

তিনি ধমকে উঠলেন এবারে, 'চুপ থাক। পান মুখে রইছে অহনো।'

লোকটি হাত বের করে হাঁসতে হাঁসতে নিজের কাজে হাত লাগাল। যুবক তারদিকে ইঙ্গিত করে জিজ্ঞেস করল, 'আপনার খুব কাছের মানুষ মনে হয় ?'

তিনি একটু সময় নিয়ে কি যেন চিন্তা করলেন। তারপর উদাসভাবে বললেন, 'না। ভাব দেইখা মনে হয় হেমায়েতপুরের দোসি-। আসলে ডালভাত।'

'কোথাকার দোসি- ?'

'হেমায়েতপুর, হেমায়েতপুর। পাবনা হেমায়েতপুর। মেন্টাল।'

যুবক অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, 'সেখানেও ছিলেন নাকি ?'

তিনি বললেন, 'থাকলাম আর কই। একজন কইল পাঠাইব, তা-তো পাঠাইল না। মনেহয় খরচার কথা ভাইবা কাট মারছে। যাইতে চাইলেই কি চান্স পাওয়া যায় ভাবছেন। সব যায়গায় নো ভ্যাকেন্সি। যায়গা নাই। ওখানে যাইতে মন্ত্রীর সুপারিশ লাগে। তয় একটা কতা কই ভাইজান, গেলে আরামে থাকতে পারতাম। পাগলের আবার জাত কি? ব্যাক পাগলেই পাগল। কেউ টাকার পাগল, কেউ ক্ষমতার পাগল, কেউ কথার পাগল, হগ্গলেই পাগল। ধনী-গরীবে ভেদ নাই, শিক্ষিতে মুর্খে তফাৎ নাই, খালি পাগল আর পাগল। এমনে পাগলই ভাল। কোন

রাখঢাক নাই, সামনেও যা পিছনেও তা। একবার ঢুকতে পারলে, বুঝলেন ভাইজান, আর বাইর হইতাম না। বাইরের কতা কইলেই এমন পাগলামি শুরু করতাম-'

আমার অন্যপাশে ততক্ষনে আরেক আসর শুরু হয়েছে। এই আসরের মুল বক্তা রোগামত একজন। চোখে পুরু চশমা। তার কথা কানে এল, 'আগে ভোট দিতে হত নিজের নিজের এলাকায়। যার যেখানে লিষ্টে নাম থাকত সেইখানে। সেইজন্য সমস্যা হত। তিন যায়গায় নাম থাকলে তিন যায়গায় ভোট দিত। এইবার সেই সুযোগ নাই। ভোটার কার্ড হাতে থাকলে ভোটার। যে যেইখানে থাকব সেইখানে ভোট দিব।'

তিনি থামলেন। তার পাশের মোটামত একজন আগ্রহ নিয়ে তারদিকে চেয়ে রয়েছে। বক্তা বললেন, 'এতে আবার অন্য সমস্যাও আছে-'

তার পাশের জনের আগ্রহ আরো বেড়ে গেল।

তিনি বললেন, 'যারা ক্যান্ডিডেট তাদের সমস্যা-'

এরপর আর কিছু না বলে বিজ্ঞের মত মাথা নাড়তে থাকলেন। বোঝা যাচ্ছে নিজের সমস-জ্ঞান এত সহজে হাতছাড়া করতে রাজী নন।

আমি খালি কাপটা ফেরত দিয়ে চায়ের বিল দিয়ে ঘুরে দাঁড়াতেই চমকে উঠলাম। একেবারে আশাতীতভাবে দেখলাম আকবর দাঁড়িয়ে আছে। আমি দ্রুত এগিয়ে গেলাম তার দিকে।

'আরে আপনি ? এখানে কোথায় ?'

আকবর বলল, 'এমনি। হাটতে হাটতে আইসা পড়লাম। শুনছিলাম আপনে এইদিকে থাকেন। মনে কইল এদিক ওদিক ঘোরাঘুরি করলে দেখা হইতেও পারে।'

আমি না হেসে পারলাম না, 'অবাক কান্ড তো। অফিসে একবার বললেই আমি সাথে করে আনতাম।'

আকবর কোন উত্তর না দিয়ে হাসল।

আবারো দুকাপ চা দিতে বললাম। আকবরের দিকে ঘুরে বাড়ির দিকে হাত তুলে বললাম, 'এখান থেকে তিনটা বাড়ি পরেই। এককাপ চা খেয়ে যাই।'

আকবরকে সাথে নিয়ে আরো এককাপ চা খেয়ে রীতিমত জোর করে বিল দিয়ে আকবরকে সাথে নিয়ে নিজের ঘরে এসে ঢুকলাম। ভেবেছিলাম আকবর আমার ঘরের চেহারা দেখে নাক সিটকাবে। কিন' সেটা করল না। বরং প্রশংসা করল, 'খুব ভাল। একেবারে নিরিবিলি। কোনরকম ঝুটঝামেলা নাই। এইজন্যই আপনে ভাল থাকতে পারেন।'

আমার বুক দুরুদুরু করতে শুরু করল। একজনের সমস্যার কথা শুনে আমার চিন্তাশক্তি লোপ পেয়েছে। এ যদি তার পারিবারিক সমস্যার কথা বলতে শুরু করে তাহলে বিপদ। তাড়াতাড়ি কথা ঘুরানোর জন্য বললাম, 'জানালার বাইরেটা এখনো ফাঁকা। কদিন থাকবে কে জানে। মনেহয় অল্পদিনেই ছয়তলা উঠতে শুরু করবে।'

আকবর বলল, 'হাউজিং ব্যবসার অবস্থা খুব ভাল না। আমেরিকার অবস্থা কাহিল।'

আমি বললাম, 'আমেরিকার হাওয়া এতদুর আসে না। মানুষ তিরিশ, চল্লিশ, পঞ্চাশ লাখে এপার্টমেন্ট কিনেই খুশি। মাসমাস বাড়িভাড়া দিতে হয় না।'

আকবর বলল, 'পঞ্চাশ লাখ ব্যাংকে রাখলে সুদের টাকায় তিনডা বাড়ি ভাড়া করন যায়।'

‘তাই না-কি ?’ চমকে উঠলাম আমি।

আকবর বলল, ‘পঞ্চাশ লাখে ব্যাংক প্রতিমাসে পঞ্চাশ হাজার দিব। মাসে দশ-পনের হাজার টাকা ভাড়ার বাড়ির জন্য আমি সেই টাকা ইনভেষ্ট করমু ক্যান ?’

আমি অবাক হয়ে বললাম, ‘তাহলে মানুষ এত টাকা দিয়ে এইসব বাড়ি কিনছে কেন ?’

আকবর নির্লিপ্তভাবে বলল, ‘কেনে দুইধরনের মানুষ। যাগো টাকা খরচার যায়গা নাই, রাখার যায়গা নাই তারা। ভাড়া বাড়িতে বালিশের তলায়, বিছানার তলায় আর কত রাখা যায়। আর কেনে যারা মনে করে পাঁচ লাখ যহন পঞ্চাশ লাখ হইছে তখন পাঁচ কোটিও হইব।’

হঠাৎ করেই উপলব্ধি করলাম আকবর আমার চেয়ে অনেক বেশি খবর রাখে। এসব বিষয় নিয়ে আমি কখনো ভাবিনি। ব্যাংকে একটা একাউন্ট পর্যন্ত করিনি কখনো।

আকবর বালিশটা টেনে তাতে হেলান দিল। তারপর শুয়েই পরল। দেখে ভাল লাগল আমার। কাউকে আপণ ভাবলে তবেই কেউ এমন আচরন করে। ঘনিষ্ঠতা বলতে যা বুঝায় আকবরের সাথে তা আছে বলে কখনো মনে হয়নি। এখন এই মুহূর্তে মনে হল তার চালচলন, কথাবার্তার বাইরে আরো কিছু রয়েছে। যা এতদিন আমার কাছে ধরা পরেনি।

আকবর জানালা দিয়ে বাইরে আমগাছটার দিকে তাকিয়ে থেকে উদাসভাবে বলল, ‘আপনের সেই গাড়িটা দেখলাম।’

আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, ‘আমার গাড়ি!’

আকবর বলল, ‘আপনে যে নম্বরডা কইছিলেন। আপনের বন্ধুরে চাপা দিছে সেই গাড়ি। কাকলি ষ্ট্যান্ডের কাছে এক বাড়িতে থাকে। চৌত্রিশ বাই চার।’

আমার অবাক লাগল। আকবর বিষয়টাকে এত গুরুত্ব দেবে এটা যেন অবিশ্বাস্য। সে নাম্বারটা মনে রেখেছে, গাড়িটা কোন বাড়িতে থাকে সেটাও জেনেছে। হয়ত গাড়ি যে চালায় তাকেও দেখেছে।

আমার বিষয়টা ভাল লাগল না। কথা ঘুরানোর চেষ্টা করলাম। জিজ্ঞেস করলাম, ‘আপনার কাজকর্ম কেমন চলছে ? মানে ব্যবসার প্রস্তুতি ?’

আকবর বলল, ‘বুঝতাছি না কি করমু। আপনের বন্ধুর কথা শোনার পর ক্যামুন জানি লাগতাছে। মানুষের জীবন কত সহজে যায়। মাঝেমাঝে মনে হয় কি জানেন ? যদি একটা ভাল কাম করতে পারতাম। প্রতিদিনই তো কত মানুষ মরতাছে। ভাল কাম কইরা, খারাপ কাম কইরা, কাম না কইরা। ঘরে শুইয়া, অসুখে ভুইগা, কাম করতে গিয়া, কতরকম ভাবেই না মরতাছে। সবাই একদিন মরব। যদি মরার আগে একটা ভাল কিছু করতাম।’

আমি কি বলব ভেবে পেলাম না। হতবাক হয়ে বসেই থাকলাম চেয়ারে। তারপর বাড়িতে কেউ এলে সবাই যা করে সেই পথে গেলাম।

‘চা খাবেন ? দুধছাড়া চায়ের ব্যবস্থা আছে। আপনি বসুন আমি বানিয়ে আনি।’

বলে তাকে একা থাকতে দিয়ে আমি চায়ের আয়োজন করতে গেলাম।

সবকিছু কেমন যেন এলোমেলো হয়ে গেল হঠাৎ করে। পরপর দুদিন আকবর অনুপসি'ত, হাফিজের বাড়িত তালা ঝুলছে। আনিস লাপাত্তা। রাফি সেই যে গেল তারপর আর একবারও এমুখো হয়নি। ওর ঠিকানা পর্যন্ত আমার জানা নেই। এই কজনের বাইরে পরিচিত মানুষ খুঁজে বের করা আমার জন্য খুবই কঠিন। এতদিন ইচ্ছে করেই সবাইকে এড়িয়ে চলেছি। ভেবেছি ঝামেলায় জড়িয়ে কাজ নেই। একা থাকাই ভাল। এখন মনে হচ্ছে আরো কিছু পরিচিত মানুষজন থাকলে ভাল হত। একেবারেই অপরিচিত মানুষের মধ্যে হেঁটে বেড়ালে মনে হয় আমি যেন অদৃশ্য কিছু। কেউ আমাকে দেখছে না। গায়ে ধাক্কা লাগলেও কেউ ঘুরে তাকায় না।

কাজের দিন কাজ করি বা না করি, অফিসে বসে দিব্বি সময় কাটানো যায়। তারপর কোনমতে কয়েকঘন্টা কাটালেই নিস্তার। ছুটির দিন একেবারে অসহ্য হয়ে দেখা দিল। কিছু করার না পেয়ে সারাদিন ঘুমানোর সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললাম। কিন' কাজ হল না। দুপুরের মধ্যে সবকিছু এত অসহ্য হয়ে উঠল যে আর থাকতে না পেরে বের হলাম। এক চায়ের দোকানে কাটালাম একঘন্টা, তারপর আরেক চায়ের দোকানে। তারপর হাটতে শুরু করলাম একেবারে উদ্দেশ্য ছাড়া। মনেমনে বলতে শুরু করলাম, যাইতাছি, যাইতাছি। কই যাইতাছি জানি না।

একসময় দেখলাম তুতুলের বাড়ির সামনে এসে থেমেছি। তুতুলের মা আমার দুর সম্পর্কের বোন। কতটা দুর সম্পর্কের বলতে পারব না। আত্মিয়তার চেয়েও তাদের সাথে আমার বন্ধুত্বের সম্পর্কই বড়। আমার বিপদের দিনে তারা যেভাবে সাহায্য করেছে, সাহস যুগিয়েছে তার তুলনা হয় না। সবসময় আরো করতে চায়। আমার সংকোচ হয় বলে যতটা সম্ভব দুরে থাকতে চেষ্টা করি। রীতিমত যুদ্ধ করে আলাদা থাকার ব্যবস্থা করেছি। তারপরও মাঝেমাঝে আমাকে এখানে আসতে হয়। আমাকে এখানে টেনে আনার জন্য তুতুল একটা বড় কারন।

ওর বয়স চার বছর। দেখলে মনেহয় একটা পুতুল হেটে বেড়াচ্ছে। যেমন চেহারা-মুখভঙ্গি তেমনি আচরন। আমাকে দেখলেই তার জমানো কথা বলতে শুরু করে।

আজও ব্যতিক্রম হল না। শুরু করল কৈফিয়ত দিয়ে, 'এতদিন পড়ে এলে কেন ?'

সবাই যা বলে আমাকেও তাই বলতে হল। বললাম, 'কাজে ব্যস- ছিলাম বলে আসতে পারিনি।'

ওর প্রশ্ন, 'কি কাজ ?'

আমি বললাম, 'এই- অফিসের কাজ।'

তুতুল বলল, 'ও, আচ্ছা। ঠিক আছে।'

তারপরই ওর নিজের কথা শুরু হল, 'জানো সকালে বাবা আমার কাছে মিথ্যে বলেছে। বলেছে কানে তুলা দিয়েছে। আসলে কিন' দেয়নি।'

আমি অবাক হয়ে বললাম, 'তাই নাকি!'

তুতুল মাথা ঝুঁকিয়ে বলল, 'হ্যাঁ।'

আমি ওর অবাক হওয়া মুখটা দেখলাম। চোখ বড়বড় করে চেয়ে রয়েছে। দেখে মনে হল আর কিছুটা বড় হলে এই মিথ্যেগুলো ওরও গা সওয়া হয়ে যাবে। বুঝে যাবে মিথ্যে বলা মহাপাপ হতে পারে তবুও মিথ্যে বলতে হয়। কারনে-অকারনে।

আবার ওর কথা শুরু হল, 'জানো, বাবা একটা গেম এনেছে। গুলি করে ভুত মারতে হয়।'

আমি উৎসাহ দিয়ে বললাম, 'বেশ তো। গুলি করে সব ভুত মেরে ফেলবে।'

তুতুল অবাক হয়ে বলল, 'ভুত কি কখনো মরে ?'

আমি বুঝাতে চেষ্টা করলাম, 'কেন ? মরবে না কেন ? ঠিকমত গুলি লাগলে মরবে।'

তুতুল হাসতে হাসতে সোফায় এলিয়ে পড়ল, 'মরেই তো ভুত হয়!'

ওরসাথে কথা বলে পারা যায় না। মরার পরেই যখন ভুত হয় তখন আবার মরবে কেন ? আবার মরে কি হবে ? ভুতের ভুত ? মকবুলের ভুতও তো সেকথাই বলেছিল। ভুতের রাজ্যে কেউ মরে না। যারা গেম তৈরী করেছে তারা এই সহজ কথা জানে না ?

আমি সোফায় আরাম করে হেলান দিয়ে বসে হাই তুললাম। তুতুল জিজ্ঞেস করল, 'অমন করছ কেন ? ঘুম ধরেছে ?

আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'তুমি ঘুমাবে না?'

তুতুল বিজ্ঞের মত বলল, 'দুপুরে ঘুমাতে হয় না।'

একটু থেমে আমার তরফ থেকে কোন উত্তর না পেয়ে আবার তার কথা শুরু করল, 'জানো দুপুর হলে দাদু সবাইকে ধমক দেয়। বলে কেউ শব্দ করবি না। আমি ঘুমাব। আসলে কিন' ঘুমায় না। চোখ বন্ধ করে শুয়ে থাকে।'

এই তত্ত্ব আমি জানি। বিশেষজ্ঞরা বলে শিশুদের বেশি করে ঘুমাতে হয়। এটা তাদের শারিরীক-মানষিক বৃদ্ধির জন্য সহায়ক। অন্যদিকে বুড়োদের না ঘুমালেও চলে। অথচ শিশুরা ঘুমাতে চায় না। দিনে-রাতে সবসময় জেগে দেখতে চায় বিশ্বের সবকিছু। আর যারা বৃদ্ধ তারা চেষ্টা করে যত বেশি সম্ভব ঘুমানোর।

আসলেই তো। তারা নতুন করে আর কি দেখবে!

তুতুলকে জিজ্ঞেস করলাম, 'কিসের ছবি এঁকেছ ?'

তুতুল বলল, 'ভুত। দাঁড়াও দেখাচ্ছি।'

সে উঠে রওনা হল। তখনই তুতুলের মা এসে বাধা দিল তাতে। তুতুলকে বলল, 'পরে দেখাবে। আগে তোমার মামা খেয়ে নিক।'

আমাকে বলল, 'যা হাতমুখ ধুয়ে টেবিলে বস।'

আমি আপত্তি করতে চেষ্টা করলাম, 'আমি কিছুক্ষন আগেই খেয়ে এসেছি। এখন খাবার উপায় নেই।'

তুতুলের মা বলল, 'তোর খাওয়া কি সে জানি। কথা না বাড়িয়ে খেতে বস। তুতুল দেখতো মামা ঠিকমত খায় কিনা।'

জানি আপত্তি করে লাভ কবে না। আর তুতুলেরও এবিষয়ে আগ্রহের কমতি নেই। টেবিলের পাশে দাঁড়িয়ে থেকে ক্রমাগত প্লেটে খাবার উঠিয়ে দিতে থাকবে। কোন কথাতেই কাজ হবে না। বেশি আপত্তি করলে বলে, 'মামনি, হাত চেপে ধরতো। দেখি- খাবে না!'

এরপর নিজের হাতে চামচ নিয়ে মুখে ঢুকিয়ে দেবে।

খাবার টেবিলে বসে জিজ্ঞেস করলাম, 'তুতুলের বাবাকে দেখছি না। ছুটির দিন দুপুর বেলা কোথায় গেছে?'

তুতুলের মা বলল, 'আর বলিশ না। কি এক ঝামেলা পাকিয়েছে। অফিসের কাকে টাকা দিয়েছে কোন কাগজপত্র ছাড়া, এখন সে অস্বীকার করছে। এখন কোনভাবে কোথাও থেকে টাকা ম্যানেজ করে দিয়ে নিজের মানরক্ষা করা।'

আমি অবাক হলাম, 'অন্য কেউ জানেনা ?'

তুতুলের মা বলল, 'সবাই জানে। ওর স্বভাব তো জানিস। কথা একটু অন্যভাবে বললে মান যায়। কোনরকম কথা বাড়ায়নি। কতই তো দেখলাম।'

আমি বললাম, 'তুমি নিষেধ করনা। সাবধানে না থাকলে কখন কোন সমস্যায় পড়বে তার ঠিক কি ?'

তুতুলের মা বলল, 'নিষেধ করে লাভ নেই। বুঝে ওঠার আগেই ঠকে বসে থাকে। থাকগে ওসব নিয়ে মাথা ঘামিয়ে কি হবে। ভাল মানুষের আল্লা সহায়। এতকিছুর পরও তো ভালভাবে চলে যাচ্ছে। কোন না কোনভাবে একটা পথ বের হয়ে যায়। অন্যদের চেয়ে ভাল আছি।'

তার কথাই ঠিক। ভালমানুষের আল্লা সহায়। কোন না কোনভাবে একটা পথ বের হয়ে যায়। নাহলে আনিস আমার কাছে টাকা রেখে যাবে কেন ? আর আমিই বা হঠাৎ করে এসে এখবর পাব কেন ?

জিজ্ঞেস করলাম, 'কত টাকা জান ?'

তুতুলের মা বলল, 'ঠিক জানি না। লাখখানেক মত।'

তারমানে আনিসের দেয়া টাকার আওতার মধ্যে। মনেমনে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললাম। বললাম, 'ফিরে এলে জিজ্ঞেস করবে কত টাকা। আর এরমধ্যে যদি কোন ব্যবস্থা না হয় তাহলে চিন্তা করতে নিষেধ করবে। আমি দেখব একটাকিছু ব্যবস্থা করা যায় কিনা।'

তুতুলের মা বলল, 'তুই এতটাকা পাবি কোথায় ? নিজেই কত কষ্ট করে চলিশ।'

আমি বললাম, 'সে তোমাকে ভাবতে হবে না। আজকাল মানুষ খুব সহজে লাখটাকার মালিক হয়।'

তুতুলের মা বলল, 'আচ্ছা দেখিস। মাসদুয়েকের জন্য ধার পেলে একটাকিছু ব্যবস্থা করে নেয়া যাবে। আমার কিছু গহনাপাতি আছে ওগুলো বিক্রি করে দেব। এখন সোনার অনেক দাম।'

আমি বললাম, 'ওসব বিক্রিটিক্রির মধ্যে যাবে না। আমি ব্যবস্থা করতে পারব।'

কোনমতে খাওয়া শেষ করে আরো কিছুটা সময় কাটিয়ে রওনা হলাম বাড়ির দিকে। আনিসের দেয়া টাকাগুলো আজই দিয়ে যাব তুতুলের মাকে।

তালা খুলে ঘরে ঢুকে সোজা টেবিলের পাশে এসে দাঁড়ালাম। চাবিটা নিয়ে তালায় ঢুকিয়ে ঘুরালাম। আর সাথেসাথে বুকটা ছ্যাৎ করে উঠল। তালা খোলা।

একটানে ড্রয়ারটা বের করে ফেললাম।

আনিসের দেয়া খামটা ড্রয়ারেই আছে। তাড়াতাড়ি খামটা খুলে টাকাগুলো হাতে তুলে দেখলাম। ব্যাংক যেভাবে কাগজ দিয়ে সেলাই করে সিল লাগায় ঠিক সেভাবেই রয়েছে। কেউ খোলেনি।

তারমানে কেউ ড্রয়ারে হাত দেয়নি। নিজেই কোন একসময় মনের ভুলে ড্রয়ার খুলে রেখেছি।

একটা বান্ডিল হাতে নিয়ে সেলাই খোলার চেষ্টা করলাম। তক্ষুনি মনে পড়ল, ড্রয়ারে একটা পিস-ল ছিল। সেটা নেই।

ঘরের চারিদিকে তাকিয়ে দেখলাম একবার। মনে করার চেষ্টা করলাম কি ঘটতে পারে। হয়ত কোন এক সময় ড্রয়ার খুলেছি নিজেই। তখনই পিস-লটা বের করেছি। লুকিয়ে রেখেছি অন্য কোথাও। ড্রয়ারে আর তালা লাগানো হয়নি।

কিছুই মনে পরল না।

টাকাগুলো সেভাবেই ড্রয়ারে রেখে পিস-লটা খোঁজার চেষ্টা করলাম। এই ঘরেই আছে কোথাও। আর যাই হোক, মনের ভুলে বাইরে নিয়ে যাইনি। এতটা ভুলোমন এখনো হয়নি।

ঘরের যাকিছু ছিল, বইপত্র, জামাকাপড়, বিছানা সবকিছু তছনছ করে ফেললাম। পিস-লটা পাওয়া গেল না।

নিজেকেই প্রশ্ন করতে হল একসময়, আসলেই কি পিস-ল ছিল। নাকি পুরোটাই আমার মনের ভুল। হয়ত কখনোই ড্রয়ারে পিস-ল ছিল না। আমার মনে হয়েছে ছিল, এখন মনে হচ্ছে নেই।

কিন' সেটাই বা কিভাবে হয়! আমি সেটা হাতে নিয়ে দেখেছি। খুলে গুলি দেখেছি। সবগুলো যায়গা ভরা ছিল গুলি দিয়ে। এতবড় ভুল হতে পারে না। আগে কখনো হয়নি।

কোনমতে বিছানা বসার যোগ্য করে বসলাম। মনে মনে গোছাতে চেষ্টা করলাম সবকিছু।

পিস-লের কথা আমি কাউকে বলিনি। হাফিজকে বলতে চেয়েছিলাম কিন' বলা হয়নি। অন্য কাউকে বলার প্রশ্নই আসেনা। তাহলে ?

কেউ বের করে নিয়েছে ড্রয়ার থেকে ?

কে এসেছিল এই ঘরে ? পিস-লটা দেখার পর থেকে ?

আনিস এসেছিল। তার কথা মনে করতে চেষ্টা করলাম। আমি ওকে রেখে চা আনতে গিয়েছিলাম। ও বসে ছিল চেয়ারে। হাত বাড়ালেই ড্রয়ার। এখন মনে পড়ছে, আমি ঘর খুলে তালাচাবি দুটোই রেখেছিলাম বিছানায়। পরে চাবিটা পেয়েছি টেবিলে। তাহলে কি আনিস ?

একেবারেই অবিশ্বাস্য বিষয়টা। আনিসের কোনকিছুর সাথে মেলে না।

আর কে এসেছিল ? রাফি।

হাফিজ।

আকবর।

রাফি কি নিতে পারে? ওকে ঘরে রেখে বাইরে গিয়েছিলাম টাকা ভাঙাতে। ও একা ছিল ঘরে। ড্রয়ার খুলে দেখতেই পারে। এই বয়সে পিস-লের দিকে আগ্রহ থাকতেই পারে। কিন' - তার পাশেই টাকা ছিল। রীতিমত লক্ষ টাকা। সেটায় হাত দিল না কেন ? নাকি বোঝেনি খামের মধ্যে টাকা।

না কি হাফিজ ? হাফিজ জানে পিস-ল কি জিনিষ। হয়তো ব্যবহারও করেছে রাজনীতি করার সময়। বেশ কবার গল্প করেছে এসব বিষয়ে।

না কি আকবর। সেও এসেছিল ঘরে। তারও সুযোগ ছিল পিস-লটা বের করে নেবার।

এই চারজন ছাড়া অন্য কেউ ঘরে ঢোকেনি।

আমার মাথা ঘুরপাক খেতে লাগল।

যেই নিয়ে থাকুক, কোন উদ্দেশ্যে নিয়েছে। যদি কোনভাবে ধরা পরে তাহলে আমাকেও জড়াবে এর মধ্যে। পুলিশের দুঘা খেলেই গড়গড় করে বলে দেবে কোথায় পেয়েছে পিস-ল।

যদি আমাকে জিজ্ঞেস করে কোথায় পেয়েছি, তাহলে ?

কাকে জিজ্ঞেস করব আমি।

হঠাৎ করেই মকবুলের ভুতের কথা মনে হল।

সাথেসাথে মনটা হাল্কা হয়ে গেল। পিস-লটা নিশ্চয়ই সে-ই রেখেছিল ওখানে। হয়তো চেয়েছিল আমি তার হয়ে প্রতিশোধ নেব। আমি সেটা পারব না বুঝে পিস-লটা সরিয়ে নিয়েছে। অথবা ক্ষমা করে দিয়েছে লোকটাকে। তারজন্য সেটাই মানানসই।

এটাই হবে। অন্যকিছু হওয়ার কোন কারন নেই।

আস্বস- হয়ে আমি ঘরের জিনিষপত্র আবার আগের অবস্থায় নিতে চেষ্টা করলাম। অন্তত টাকাগুলো যখন আছে আপাতত তুতুলের মাকে দিয়ে কথা রাখতে পারব।

টিপ টিপ বৃষ্টি পড়ছে। সেইসাথে ঠান্ডা হাওয়া। পথঘাট একেবারে খালি। আমি দাঁড়িয়ে আছি অন্ধকারে। রাস্তা দিয়ে হেঁটে গেলেও কেউ দেখতে পাবে না আমাকে। আমার সামনে একটা খোঁড়া যায়গা। কাদা জমে রয়েছে সেখানে। কোন গাড়ি এদিক দিয়ে গেলে তাকে গতি কমাতে হবে।

বামদিকে তাকালাম। রাস্তা কিছুদুর গিয়ে উঠে গেছে ওপরদিকে। গ্যারেজে গাড়ি ঢোকানোর যায়গা। পাশে একটা ফুলগাছের ঝোপ। তারপাশে লাল রঙের দেয়াল। দেয়ালে পিতলের একটা প্লেট লাগানো। বড়বড় করে লেখা চৌত্রিশ বাই চার।

আমি অপেক্ষা করছি। আমি জানি একটা গাড়ি আসবে। আমার সামনের রাস্তা দিয়ে এগিয়ে যাবে গ্যারেজের দিকে। আমি নিশ্চিত, আসবেই।

বাতাসে একগোছা চুল এসে পড়ল আমার চোখের সামনে।

আমার চুল এত লম্বা না। লম্বা চুল আনিসের। লম্বা চুল হাফিজের। লম্বা চুল রাফির, আকবরের।

আমি দাঁড়িয়ে আছি। রাস্তায় একটা গাড়ি ঘুরছে। লাল রঙের গাড়ি। এখনই আসবে আমার সামনে। আমি ডানহাত উচু করলাম। সেই হাতে একটা পিস-ল। এই পিস-লটাই ছিল আমার ড্রয়ারে।

গাড়িটা এগিয়ে আসছে। আমি হেডলাইটের আলো দেখতে পাচ্ছি। এখন গাড়িটাও দেখা যাচ্ছে। গর্তটার সামনে এসে গতি কমাল। সেই ড্রাইভার। দেখতে পেয়েছে আমাকে। গাড়ি থামিয়েছে।

ঘুরে তাকাল সোজা আমার দিকে।
(শেষ)